भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182Qc
पुस्तक संख्या
Book No 923.1(7)
रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—59 LNL/64—1-11-65—100,000

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP will be charged for each day the book is kept beyond a month.

4 FEB 1960
25 JAN 1962
24 ... 1962
4 OCT 19..
30 ...
5 JUN 1961
18 ... 1985
19 AUG 1966
25 OCT 1972
14 JAN ...

N. L. 44.
MGIPC—S1—111 LNL/58—24-6-58—50,000.

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ প্রতি সংখ্যা ৵৹, বার্ষিক মূল্য ৩৷৹

কল্লোল

সম্পাদক : শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

182. Rc. 923. 1 (7)
BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE CALCUTTA 17. FEB 1930
645 14. 2. 30.
NATIONAL LIBRARY No. Imp 3958 DATE CALCUTTA
RARE BOOK

-রেশমী

উৎসবে— বিলাসে— স্নানে

অপূর্ব্ব রমণীয় স্নিগ্ধকর

ব্যবহারে কেশের গোড়া শক্ত, কেশের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি ও কেশ-গুচ্ছ মেঘপুঞ্জের মত সুকোমল ও সুন্দর করে। গুণে, গন্ধে রেশমী উৎকৃষ্ট ও অতুলনীয়।

প্রস্তুতকারক—মিরা ৮৩, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

IMPERIAL LIBRARY

পুরাতন ও প্রসিদ্ধ কয়েকখানি বই

রবীন্দ্র জন্মতিথি

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বলিত বাঙলায় প্রথম জন্মতিথি পুস্তক। গোলাপী কাগজে সুন্দর ছাপাই, মনোহর মলাট, কবিবরের গান ও কবিতা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য—২৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

পরীস্থান

ছেলেদের জন্য উপাদেয় বড় গল্পের বই। মলাটে ও ভিতরে ছবি। জলের মত সরল, সহজ ভাষা। প্রসিদ্ধ গল্প-লেখক ৺গোকুলচন্দ্র নাগের রচনা। মূল্য—৸৹ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

ঝড়ের দোলা

শ্রীযুক্ত মণীলাল বসু, ৺গোকুলচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী বি, এ : শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশের লেখা চারিটি গল্প। মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ৸৹ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

উতঙ্ক

বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য নাটক। শিক্ষা ও অভিনয়ের আনন্দ এক সঙ্গে উপভোগ করিবেন। স্ত্রী-ভূমিকা নাই। লেখার মনোহারিত্ব এই পুস্তকখানিকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছে। বহু স্থানে অভিনীত হইয়াছে। মূল্য—৷৹ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

—আপনার পুস্তকের দোকানে চাহিয়া পাঠান—

অথবা

"কল্লোল কার্য্যালয়," ১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

কল্লোল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

৭ম বর্ষ—১৩৩৬

বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০

প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

IMPERIAL LIBRARY

বিষয়-সূচী

কল্লোল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। গন্ধ	(গল্প)	শ্রীপ্রণব রায়	৪০৩
২। দুটি কথা	(কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪০৯
৩। ভূতের বোঝা	(গল্প)	শ্রীকল্যাণী পাল	৪১০
৪। রামধনু	(গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্র দাস	৪১৮
৫। ঝপ্‌ঝপের দত্ত্	(কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	৪২৬
৬। প্রবাহ—			
(ক) শিবরাম চক্রবর্তীর কবিতা		শ্রীলীলাময় রায়	৪২৮
(খ) টমাস্ ম্যান্		শ্রীসত্যেন্দ্র দাস	৪৩০
৭। যোগ্যতা	(কবিতা)	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৪৩২
৮। রাতের বাসা	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ	৪৩৩

কেশরঞ্জন

* *

গুণে ও গন্ধে

* *

অপরাজেয়

* *

কেশরঞ্জন

* *

মা লক্ষ্মীদের

* *

নিত্য ব্যবহার্য্য

* *

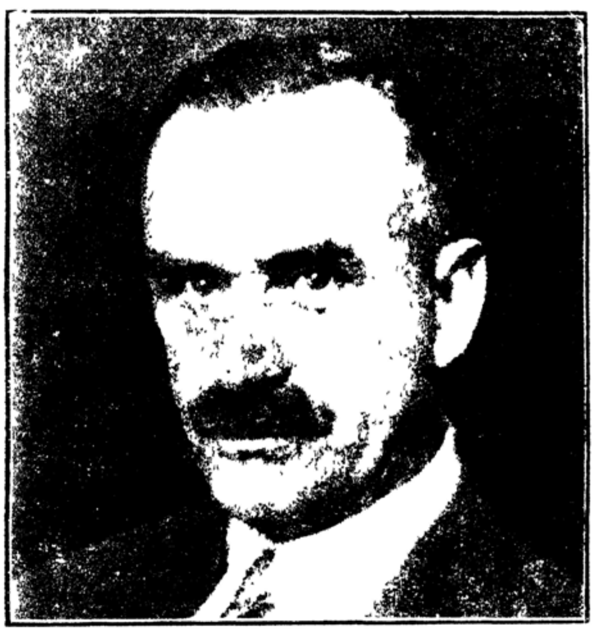

টমাস ম্যান্

বিষয়-সূচী

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

কল্লোল

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
৯। পাটের ক্ষেতের মায়া	(কবিতা)	শ্রীমনোজ বসু	৪৩৭
১০। চলচ্চিত্র		ডি-আর	৪৩৯
১১। ডায়েরী	(গল্প)	শ্রীপরিমল গোস্বামী	৪৪১
১২। মাসিক-সংবাদ			৪৪৮
১৩। পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়-লিপি			৪৫০

চিত্র

১। টমাস্ ম্যান্ মুখ পত্র

বেয়ানের আমার মনটী বেশ,
তত্ত্ব করেছে কেক্ সন্দেশ

শীতের তত্ত্বে বেয়ানকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে আমাদের উপাদেয় মিষ্টান্নগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

একমাত্র বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা

১১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

ফোন নং ৩১৪৭ বড়বাজার।

গানের আনন্দে জাগে প্রাণের আনন্দ

মল্লিক ফ্লুট
হারমোনিয়ম

মল্লিক্ ফ্লুট
হারমোনিয়ম

নামের একটা দাম আছে, মল্লিক্ ফ্লুট্ এই নাম কিনেছে শুধু জিনিষের গুণে
আপনাদেরও জিনিষের গুণ দেখেই কিনতে বলি।

মল্লিক ফ্লুট

কিনলে সুখীই হবেন

সব রকম বাদ্যযন্ত্র ও বেতার যন্ত্রের সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ দোকান

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন—কলিঃ ২৮৭৭ টেলিগ্রাম—ফনোগ্রাফ্

৭ম বর্ষ, ১৩৩৬

কল্লোল

অগ্রহায়ণ ৮ম সংখ্যা

গল্প

শ্রীপ্রণব রায়

দোতলার কোণের কুঠুরী থেকে দিবারাত্রি হাসির ঝঙ্কার শোনা যায়—মেয়েলি গলায় কথাও।

নতুন ভাড়াটে এসেচে বোধ হয়। কতো ভাড়াটেই তো আসে; আবার একদিন 'ঘর ভাড়া'-লেখা পিজ্‌বোর্ডটা সদর দরজার সম্মুখে তেম্‌নই ঝুলতে থাকে। বহু প্রাচীন এই মাঠকোটাটি; এর বয়েস নির্ণয় করা মুস্কিল। অন্ধকার অপরিসর কুঠুরীগুলোকে কোটর বলাই উচিত। লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের মতো ছিটে-বেড়ার গা থেকে মাটির প্রলেপ খ'সে পড়্‌চে। তা' পড়ুক—। তবু কতো পান্থ ভীরু আশা, স্বল্পায়ু হাসি আর কয়েক ফোঁটা অশ্রুর সঞ্চয় নিয়ে এরি কোটরে নীড় বেঁধেচে; আবার একদিন পৃথিবীর পথে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গ্যাচে।

কে-ই তা'দের খবর রাখে!

একতলায় সিঁড়ির গোড়ায় পূব-মুখো ঘরখানায় ভজহরির আস্তানা। বেলা দশটা নাগাদ্ রোজ ছিটের-কোট-গায়ে একটি শীর্ণকায় ছোক্‌রাকে দরজায় কুলুপ এঁটে বেরিয়ে যেতে গ্যাখা যায়। কোন্ এক ছোটখাটো প্রেসে সারাদিন নগণ্য কম্পোজিটারের কাজ করে। ফির্‌তে বেলা নিভে আসে।

পাশের ঘরে থাকে এক মেসের ঠিকা বামুন—পুরুষোত্তম মিশির। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পুরুষোত্তম এসে ভজহরিকে নিজের আস্তানায় ডাকে, আসেন্ বাবুমোশাই, এক হাঁথ্ দাবা খেল্ হো যায়।

হিন্দুস্থানী হ'লে কি হয়, মিশিরজীর বাংলাকথা কইবার সখটুকু আছে। খেলা চলে, যতক্ষণ না নির্ব্বোধ ভজহরির উপর্য্যুপরি পরাজয়ে বিরক্ত হ'য়ে মিশিরজীর জয়ের স্পৃহা লোপ পায়। তারপর, পরিশ্রান্ত পশুর মতো নিদ্রা।

এই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা!

নব নব আশা নেই, মধুর মিথ্যার মোহ নেই, জীবনে ওর একটিও বৈচিত্র্য ক্ষণেকের জন্যও বর্ণচ্ছটাপাত করে না! জগতের এই বিস্তৃত জনারণ্যের মাঝে ও একটি দুর্ব্বল

শীর্ণ তৃণপল্লব—বেঁচে থাকাই চরম সার্থকতা। রোগা কালো মুখে উৎসাহহীন উদাসীনতা মাখা; লক্ষ্যহীন চোখের তারায় আছে নিরানন্দ, নির্ব্বুদ্ধিতা। আনন্দ ও বেদনা ওর কাছে সমান দুজ্ঞের্য়! বোঝে শুধু ক্ষুদ্রতম একটি জল-বুদ্বুদের মতো অনন্ত জীবন-প্রবাহের বুকে ভেসে চলা—মৃত্যুর মহাসাগর পর্য্যন্ত।

কিন্তু গোল বাধিয়েচে ওই ঝঙ্কৃত হাসি, দোতলার কোণার কুঠুরী থেকে যখন-তখন ভেসে-আসা কলকণ্ঠ। কাণে বাজ্‌লেই সব কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়! কাণদু'টোও যে আজকাল সর্ব্বদাই সজাগ হ'য়ে থাকে, নিজেরি কাছে কতোবার তা' ধরা প'ড়ে গ্যাচে!

দাবা খেল্‌তে ব'সে মিশিরজী অন্যমনস্ক ভজহরিকে বলে, ঘোঁড়া বাঁচানে নেহি পার্‌বে বাবুমোশাই—আপ্‌কা মেজাজ আজ বিল্‌কুল্‌ বে-দুরস্ত্‌!

ঘোড়াকে বাঁচাতে গিয়ে ভজহরির গজ নিহত হয়।

অথচ, দোতলার ওই কোণের কুঠুরীতে কতো লোক এলো, গ্যালো। কেউ তো এ অকারণ কৌতূহল জাগায় নি; কারো হাসির প্রতিধ্বনিও বুকে বাজে নি কখনো—

এবং, নিজেকে নিয়ে এমন বিব্রত ও আর কোনদিন হয় নি!

ভজহরি দেখ্‌লে, অচেনা একটি মেয়ে জল-ভরা কল্‌সি কাঁখে নিয়ে, সিক্তবাস সাম্‌লে চ'লে যাচ্চে—তা'রই দরজার সুমুখ দিয়ে। কলতলার আনাগোনার পথ ওরই কুঠুরীর সুমুখ দিয়ে বটে। ভজহরি অবাক্‌ হ'য়ে তাকালে—রুক্ষ পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যেন বিচিত্র একটি ফুল চোখে পড়্‌ল!

কলসি-কাঁখে মেয়েটি একটির পর একটি সিক্ত পদচিহ্ন এঁকে চ'লে গ্যালো।

তবু, মধ্যদিনের নিস্তব্ধতা কা'র লঘু পদশব্দে মুখর হ'য়েই রৈল! কালো দেহে সে কী শ্রী—লালপেড়ে সাদা শাড়ীতেও চমৎকার মানিয়েছিল! এলোচুলে পিঠখানি অন্ধকার! পেছন ফিরে একবার তাকিয়েছিল না? সেই চোখ দু'টি মনে পড়্‌লে, তা'রি অতলতায় মন তলিয়ে যায়!

ব'সে ব'সে ভজহরি ভাবে—

দু'প্রহরের এই শূন্যতার মাঝে অকস্মাৎ ও একটি অবলম্বন পেয়ে গ্যাচে। তাই, সেই অবলম্বনটিকে ঘিরে মৌমাছির মতো ওর মনের গুঞ্জরণ আর থাম্‌তেই চায় না!

প্রেস্‌ বন্ধ সে-দিন। ঘরে ব'সে ব'সে ভজহরি নিশ্চিন্ত আলস্য উপভোগ করছিল। বেলা তিনটে বাজে; মিশিরজী মেসের কাজে বেরিয়েচে। দরজার কাছে আকাশের উদ্বৃত্ত এক-টুক্‌রো রোদের আলো; সেই দিক পানে দু' চোখ মেলে ভজহরি জড়-পদার্থের মতো প'ড়ে থাকে। অসম্ভব কোনো কল্পনা ওর নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা ও ভাব্‌তে পারে না, এমন কি একটিও সুগোপন স্মৃতির সঞ্চয় খুঁজে পায় না, যেটাকে নিয়ে এই শূন্য অবকাশ ভ'রে তুল্‌তে পারে!

এম্‌নি সময় লঘু পদধ্বনি—

কিন্তু চেনাচিনি হবে, তা' কে ভেবেছিল!

মেয়েটি এসে মিশিরজীকে বলে, একখান্‌ চিঠি লিখে দাও না মিশিরজী। দেশে আছে এক বুড়ি পিসি—বাঁচ্‌ল কি মর্‌ল, সে-খবর পাই নি আজ একটি মাস!

হেসে মিশিরজী তা'র স্বরচিত বাংলা ভাষায় জবাব দিলে যে, বাংলা-কথা কইবার প্রতি তা'র অনুরাগ থাক্‌লেও লেখ্‌বার প্রতি মোটেই নেই। আর লিখ্‌তেই যদি হয়, তবে পবিত্র দেব-নাগরী ভাষা তো রয়েচে!

মলিন মুখে মেয়েটি শুধোলে, তবে কা'কে দিয়ে লেখাই, বলো তো?—মেয়েমানুষের এম্‌নিই দুর্দ্দশা!

মিশিরজী মৎলব 'বাৎলে' দিলে। পাশের কুঠুরীতে থাকে এক 'বাংগালি' বাবু! তাঁকে দিয়ে অনায়াসে লিখিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ভজহরি তখন প্রেসের কাজে বেরোবার উপক্রম করচে। মেয়েটি অসঙ্কোচেই ভেতরে এসে বল্লে, দায়ে প'ড়ে এলুম। চিঠি লিখে দেবেন্ একখানা? দেশের খবর অনেকদিন পাই নি কিনা—

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে ভজহরির একটু বিলম্ব হ'ল। তারপর, বিমূঢ় কণ্ঠে শুধু বল্লে, চিঠি? হ্যাঁ—তা' লিখে দেব।

কল্ কল্ ক'রে মেয়েটি ব'কে যায়, দেশে থাকে আমার পিসি। ভিটে আগ্‌লে ব'সে আছে ওই বুড়ীই—রোজ সন্ধ্যেয় পিদিম্ জ্বালে। পিসির খবর পাই নি আজ একটি মাস! অসুখ-বিসুখ করল কিনা তা'ও জানি নে! দেশে গেছ্‌লুম সেই গ্যালো বচর পুজোয়—এবার আর যেতে পারি নি। ফের ফিরে-বচর যাব'খন—। আমি ভালো আছি, চিঠি পাবামাত্তর পিসি যেন খবর দ্যায়,—এই কথাই গুছিয়ে লিখে দিন্—

সুরে সুরে সঙ্কীর্ণ নোংরা কুঠুরীর বিমর্ষ বাতাস প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। কোন মেয়ে কথা কইলে, শুনতে যে এতো ভালো লাগে, ভজহরি এই প্রথম জান্‌লে! লিখ্‌তে লিখ্‌তে ওর খেই হারিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু চুপ ক'রে থাকা মেয়েটির স্বভাব-বিরুদ্ধ। থাম্‌কা ব'লে ওঠে, মাগো, ঘরের কী ছিরি! যেন যুদ্ধ হ'য়ে গ্যাচে—ক'বচ্ছর ঝাঁটপাট পড়ে নি বলুন্ তো?

ভজহরির আজ সত্যিই লজ্জাবোধ হ'ল। বাস্তবিক, এ-রকম বিশ্রী নোংরা কুঠুরীতে থাকা উচিত নয়! কী ময়লা ওই বিছানাটা! মেঝেটা রাজ্যের ধুলো-জঞ্জালে একেবারে আঁস্তাকুড়!

জবাবের অপেক্ষা না করেই মেয়েটি ময়লা বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে চাদরটা টান্ ক'রে পাত্‌লে, ছাড়া-কাপড়গুলো কুঁচিয়ে দড়ির আলনায় টাঙিয়ে রাখ্‌লে; জলের কুঁজোর মুখটা খোলাই ছিল, কলাই-করা গেলাসটা চাপা দিলে।

ব্যস্ত হ'য়ে ভজহরি বল্লে, থাক্—থাক্—

মেয়েটি ততক্ষণে জড়ো-ক'রে-রাখা ভিজে ধুতিখানা মেলে দিচ্চে। বল্লে, নোংরা আমি মোটেই সইতে পারি নে—।

আশ্‌পাশে তাকিয়ে ভজহরি ভাব্‌লে, কী আশ্চর্য্য! কুঠুরীটাকে আর চেনাই যাচ্চে না! এরি মধ্যে এমন সুশোভন শ্রী এল কোত্থেকে?

মেয়েটি বল্লে, ভাব্‌চেন কি? এদিকে আপনার কাজে বেরোবার বেলা হ'ল যে!

চিঠি-লেখা শেষ হ'য়ে গেছ্‌ল। একবার কেসে ভজহরি শুধোলে, তোমার নাম—ইয়ে—চিঠির শেষে কি নাম লিখ্‌ব?

—লিখুন্, রাধা।

চিঠি নিয়ে রাধা চ'লে গ্যালো।

দরজায় কুলুপ এঁটে ভজহরিও প্রেসের পথে বেরিয়ে পড়ে। মনে একটি অকারণ প্রফুল্লতা; চলনে কিসের ছন্দ। পথচারী জনতার প্রত্যেককেই আজ ডেকে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। জীবনের একলা-পথে চল্‌তে চল্‌তে ও যেন হঠাৎ কি-এক সম্পদ কুড়িয়ে পেয়েচে!

কি যে পেয়েচে, তা' বুঝ্‌তে পারে না।

তবু, খুশী হ'য়ে ওঠে!

সে-দিনও তা'ই—!

ক্ষ্যাপা হাওয়ার মতো তেম্‌নি হুড়্‌মুড়্ ক'রে আসা—অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার কুঠুরীতে সুপরিচিত সুরের সৌরভ ছড়িয়ে!

ভজহরি কেমন বিহ্বল হ'য়ে পড়ে।

মেঝের ওপর ব'সে প'ড়ে রাধা বল্লে, এই এলুম্ একবার, দেখ্‌তে এলুম, কি করছেন্! দিনে ঘুমোনো অভ্যেস্ নেই বুঝি আপনার? তা' ভালো। দিন-দুপুরে

আমিও চোখের পাতা বুজ্‌তে পারি নে—! একলাটি থাকি, কথা কইতে না-পেলে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে!

কোন্‌ কথা কওয়া উচিত, ভজহরি তা' মনে মনে খুঁজ্‌তে থাকে।

রাধা থামে না; বল্‌তে থাকে, দেশ থেকে পিসির চিঠি পেলুম্‌ আজ। সদু মাসিকে দিয়ে পড়ালুম্‌—লিখেচে, খবর ভালো। পড়্‌শীদের সাথে বুড়ী গেছল তিত্থি করতে। গয়া, কাশী, ছিধাম—সব জ্যায়গায় ঘুরেচে। আমি মরি ভেবে—আপনার দেশটি কোথায় শুনি?

মুস্কিল বাধ্‌ল। বিস্মৃতির ভগ্নাবশেষের ভেতর থেকে অতীতকে খুঁজে বের করবার কোনো প্রয়োজনই এতদিন হয় নি! ভেবে ভেবে ভজহরি বল্‌লে, দেশ?—মনে পড়েচে, সেই সোনাডাঙা গাঁয়ে! ইষ্টিশান্‌ থেকে নৌকো ক'রে যেতে হ'ত আমাদের বাড়ীতে—

রাধা চট্‌ ক'রে প্রশ্ন করলে, সে-বাড়ী এখনো আছে তো? কে থাকে সেথায়—বাপ, মা? মা বেঁচে নেই, বাপও না? বৌ?

ভজহরি এতক্ষণে হাস্‌বার কারণ খুঁজে পেলে। হেসে বল্‌লে, বা'রে! বিয়েই করি নি, বৌ আস্‌বে কোত্থেকে? সে-ঘরও বানের জলে ভেসে গ্যাচে—তিন বচ্ছর আগে!

খানিক চুপ ক'রে থেকে রাধা বল্‌লে, আমারো ঠিক তা'ই! আপনজন বল্‌তে তিনকূলে একটিও মনিষ্যি নেই! মা মরুল, আমি যখন সাত বচরেরটি। ফিরে-বচর বাপও গ্যালো 'নামু'নে'তে! মানুষ হলুম্‌ ওই বুড়ীর কাছে—গাঁ-সম্পর্কে পিসি। তা'পর, এক পড়্‌শীর সাথে চ'লে এলুম এই কল্‌কেত্তায়। শুধু ভিটে আগ্‌লে ব'সে লাভটা কি বলুন্‌? নিজের দিন নিজেই কিনে নিইচি, পোড়া পেটের ভাবনা আর ভাব্‌তে হয় না। তবে, ঘর আমি পাতি নি আজো! কা'র তরেই বা—কথা কইচেন না যে আপনি?

ভজহরি নির্ব্বোধ সারল্যে বল্‌লে, কথা আমি কইতে জানি না রাধা! তোমার কথাই শুন্‌তে বেশ লাগ্‌চে—

সেই হাসি—রাধার কণ্ঠে তেম্‌নি সুর-ঝঙ্কার!

বল্‌লে, বয়েসে আমার চেয়ে বড়ো হ'লে কি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি আপনার এককোঁটাও নেই!

বোকা, বোবা ভজহরি ফ্যালুফ্যালু ক'রে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রৈল।

আঁচল থেকে একটা পান মুখে দিয়ে রাধা বল্‌লে, একটু সেয়ানা না হ'লে, সংসারে ঠকতে হয় কিন্তু। তা'যাক্‌—দেয়ালে রঙচঙে ছবি টাঙিয়েচেন দেখ্‌চি! ঝাঁট্‌ দিয়েচেন বটে, কিন্তু মেঝের আদ্দেক ধুলো তো রয়েই গ্যাচে! আর, কাপড় কুঁচোবার ও কী ছিরি! এ কি পুরুষমানুষের কাজ? বিধ'তা তা' হ'লে আর মেয়েমানুষ গড়্‌তেন না—মাগো, অমন্‌ ময়লা বিছনার চাদরে মানুষে শুতে পারে! দিন্‌, কেচে দিয়ে যাব'খন।

হাত বাড়িয়ে রাধা বিছানার চাদরখানা টেনে নিলে।

বাধা দিয়ে ভজহরি ব'লে উঠ্‌ল আহা তুমি কেন—আমিই বরং—

রাধা ততক্ষণে দরজার গোড়ায় চ'লে গ্যাচে। মুখ ফি'রিয়ে বল্‌লে, অত পব ভাব্‌তে পারি নে আমি—!

লঘু পদধ্বনিটুকু মিলিয়ে গ্যালো।

জীবনের নিরুদ্বেগ ধারাটি তেম্‌নি বইতে থাকে।

কিন্তু মৃত্যুর মতো সেই নির্জ্জীব নীরবতা আর নেই; সমগ্র জীবন যাত্রার আড়ালে একটি স্বতোৎসারিত সুর ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে! অন্তর বাহিরের সেই পূর্ব্বেকার শূন্যতা কেমন ক'রে ধীরে ধীরে ভ'রে উঠেচে আজ!

পূর্ব্বের জীবন মনে পড়ে—বিবর্ণ, বিস্বাদ! বেঁচে-থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রাণধারণ। কিন্তু সেখানে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা খেলে যাচ্চে! নিজের কাছে নিজেই রমণীয় হ'য়ে উঠেচে! অতি প্রাচীন এই পৃথিবীর বুকে কোথায় ছিল এতো শোভা, এতো সমারোহ? এই সমারোহের মাঝে নিজেরো একটি স্থান আছে, উপভোগের

দাবী আছে—এ-কথা ভাবতেও নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ হয়!

মাঝে মাঝে নিজেকে চিনতে ভজহরির গোল্ বেধে যায়—।

মাঠকোটার প্রতিবেশী রূপলাল একদিন ডেকে বল্লে, বা'রে ভজা, তোকে যে আর চেনাই যায় না আজকাল! এমন সৌখীন হ'লি কবে থেকে? দাড়ি কামিয়েচিস্, চুলও আঁচ্ড়েচিস্ পরিষ্কার ক'রে—ওকি, তোর সেই পেটেণ্ট্ কোট কোথায় গ্যালো? ফর্সা পাঞ্জাবি প'রেচিস্ যে'—নাঃ তুইও মানুষ হ'য়ে উঠ্লি!

তারপর কাছে আরো ঘেঁষে এসে বল্লে, ওপরতলার ওই রাধার সাথে বিন্দেবন-লীলে চালিয়েচিস্ বুঝি? শুনতে পাই, তোকে আজকাল খুব যত্ন-আত্তি করে! তা' তোর বরাৎজোর দেখে হিংসে হয় ভাই!

চোখ টিপে হেসে রূপলাল চ'লে গ্যালো।

ভজহরির ইচ্ছে হ'ল, তা'র সৌভাগ্যের কথা প্রত্যেকের কাছে প্রচার ক'রে বেড়ায়! পরিচিত হোক্, অপরিচিত হোক্—সবার কাছেই! দুর্ভাগা রূপলালের প্রতি ওর সত্যিই অনুকম্পা হ'ল।

ওমা, আলো জ্বালেন্ নি এখনো! অন্ধকারে ব'সে আছেন্ কেন?—অবাক্ হ'য়ে রাধা বল্লে।

প্রেস্ থেকে ফিরে ভজহরি জিরোচ্ছিল। জবাব দিলে, হ্যাঁ, এই জ্বালি।

ব'লে, হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা খুঁজে লণ্ঠনটা জ্বাল্লে।

ভেতরে এসে রাধা শুধোলে, এইমাত্তর ফিরচেন বুঝি ছাপাখানা থেকে? একটু দেরী হ'য়ে গ্যাচে আজ, না?—ওটা আবার কি হোথায়?

খানিকটা তফাতে শালপাতা-চাপা কি একটা বস্তু প'ড়ে ছিল। হেসে ভজহরি বল্লে, বিশেষ কিছু নয়। ছাপাখানার কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে মোড়ের ওই খোট্টার দোকান থেকে দু আনার পরোটা আর পয়সা দুয়েকের আলুর দম্ কিনে আন্লুম। কে আবার হোটেলের হাঙাম করে!

যা' ভেবেচি, তাই! আস্চি এখুনি—। ব'লে, রাধা চট্ ক'রে বেরিয়ে গ্যালো। ফিরে এলো হাতে একটা বাটি নিয়ে। বল্লে, শুধু আলুর দম্ দিয়ে কি খাওয়া যায়? মাছের তরকারি আন্লুম একটু—ভয় নেই, আমিও কায়েতের মেয়ে।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে ভজহরি বল্লে, না, না, আমি কি তা'ই বল্চি নাকি? তবে তোমার ভাগে কম পড়বে নিশ্চয়!

সে-কথা কাণে না-নিয়ে, রাধা বল্লে, সংসারের হাঙ্গাম পোয়ানো কি ব্যাটাছেলের কাজ? হোটেলে খাওয়া আর কাঁহাতক পোষায় বলুন? অমন্ বৈরিগী হ'য়ে থাকার চেয়ে একটি ঘর পাতুন্ মজুমদার মশাই—!

ভজহরি এইবার পরিপূর্ণ চোখে রাধার মুখের পানে তাকালে। তারপর স্পষ্ট ক'রেই বল্লে, ঘর আমি সত্যিই পাতব এবার। কিন্তু সে-ঘর সাজাবার ভার নিতে হ'বে তোমাকেই—তোমায় আর রেহাই দিচ্চি নে রাধা!

মুখে আঁচল দিয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে রাধা বল্লে, এতো কথা শিখ্লেন কোত্থেকে?

এম্নি ক'রেই বুঝি জোয়ার আসে! শুক্নো চড়ায় এম্নি ক'রেই প্লাবন জাগে!

ভজহরি বলতে লাগল, তুমি শিখিয়েচ। যে-উপকার তুমি করেচ আমার, কোনোদিন তা' ভুলতে পারব না রাধা! কী ছিলুম আমি! মরা-বাঁচা দুই-ই সমান ছিল আমার কাছে! তুমি-ই আমায় নতুন ক'রে বাঁচতে শেখালে—তোমার দেওয়া যত্নে আমার ঘর ভরল, বুক ভরল—

বাধা দিয়ে রাধা ব'লে উঠল, আচ্ছা, আচ্ছা, থামুন্! ঢের হ'য়েচে, কথার ভট্চায্যি!

তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে, হাতের বালা খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'একটা কথা বলতে এসেছিলুম মজুমদার মশাই—

বলো না, কি কথা?

বলছিলুম যে, দশটা টাকা যদি ধার দিতেন—আজ সবে মাসের পয়লা, বাবুদের বাড়ী থেকে টাকা আমি পাই নি এখনো—ঘর ভাড়াটাও বাকী প'ড়ে গ্যাচে—

জামার পকেট থেকে টাকাগুলো বের ক'রে ভজহরি বল্লে, মাইনে পেলুম আজ। পঁচিশ মাইনে, আর 'ওভারটাইম' খেটে বারো। এই সবশুদ্ধ সাঁইত্রিশ টাকা তোমার কাছে রেখে দাও রাধা, এইবার আমি একটু নিশ্চিন্ত হই—না, নিতেই হ'বে তোমায়!

বুদ্ধিশুদ্ধি আপনার হ'বে না কোনো কালে! উট্‌কো মানুষ আমি, এতগুলো টাকা নিয়ে যদি পালিয়ে যাই?

মুখ ফিরিয়ে হেসে, টাকা নিয়ে রাধা চ'লে গ্যালো।

ব'সে ব'সে ভজহরি তখন স্বপ্ন দেখ্‌চে। যে-স্বপ্ন যুগে যুগে ছন্নছাড়া মানুষকে ভুলিয়েচে—সেই নীড় রচনার স্বপ্ন!...ছোট একটি নিরালা ঘর—পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন; একটি কল্যাণী মূর্ত্তি; আর তা'র দু'টি করতলে অপরিমেয় স্নেহ, সেবা, প্রীতি! জীবনের কোনো অপূর্ণতা, কোনো অতৃপ্তিই আর নেই!...

প্রেস্ থেকে ফির্‌তে একটু বিলম্ব হ'ল। পথে এক ভদ্রপল্লীতে একটি ভালো ঘর দেখে এসেচে; ঘর যদি পাত্‌তেই হয়, তবে মাঠকোটার ওই সঙ্কীর্ণ নোংরা ঘরে চলবে না!

নিজের ঘরে না-ঢুকে ভজহরি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গ্যালো। রাধাকে নতুন ঘরের খবর দিতে হ'বে। দোতলায় উঠ্‌তেই রাধার কুঠুরী নজরে পড়্‌ল—অন্ধকার: শূন্য ঘরের দরজাটা দু'পাট হ'য়ে খোলা!

নীচে মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোয় অতি জীর্ণ একখানা হিন্দি-রামায়ণ খুলে মিশিরজী সুর ক'রে পড়্‌ছিল। ভজহরি নেমে গিয়ে শুধোলে, ওপরের সেই মেয়েটি কোথায় গ্যালো, বলতে পারো মিশিরজী?

পড়া থামিয়ে মিশিরজী খাঁটি বাংলায় জবাব দিলে, হাঁ, হাঁ, হাম বলতে পারি। উ তো হিঁয়াকা কাম্‌রা ছোড়্‌কে চলিয়ে গেলো! উস্‌কো চিজ্ ভি গাড়ীমে লিয়ে গেলো।

দরজার একটা কপাট ধ'রে ভজহরি টাল্ সাম্‌লে নিলে। শুধোলে, একলাই চ'লে গ্যালো?

একেলা নেহি বাবুজী, রূপলাল ভি উসকো সাথ্ চলিয়ে গেলো।

দড়ি-বাঁধা চশ্‌মাটি চোখে লাগিয়ে, মিশিরজী ফের সীতাপতির বিরহ-বর্ণনা সুর ক'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

ভজহরি নিজের ঘরে ঢুক্‌ল। বাতি জ্বাললে না। বার বার ওর মনে হচ্ছিল, চ'লে গ্যাচে! রাধা সত্যিই চ'লে গ্যালো!

তা' যাক্—।

কিন্তু ওর মানস-বৃন্দাবনে যে-রাধা একদা অভিসার ক'রেছিল, সে তো চলে যায়নি!

দু'টী কথা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আবার আসিব ফিরি' মরণের দিনে,
কেন আর বৃথা অশ্রু ? বাঁধো বুকে বল।
চাহ' নাই এতদিন এই ভাগ্যহীনে,
ক'টা দিন কেটে যা'ক্, মোছ' অশ্রুজল।

এতদিন জ্বলিয়াছি মরম-জ্বালায়
সে জ্বালার স্পর্শ তব লাগেনি পরাণে ;
আর কেন ছেড়ে দাও।—বিদায় ! বিদায় !
—এখনো নারীর হিয়া এত রঙ্গ জানে ?

আর না চাহিব কিছু,—কোন প্রতিদান ;
বাঁধিবনা বুকে আর সাগ্রহে জড়ায়ে,
না এলে হবেনা আর রোষ, অভিমান,
চলিবার পথে কাঁটা দিব না ছড়ায়ে।

যাই তবে, একবার মরণ-বেলায়
আসি যদি—দেখা দিও এই অভাগায়।

ভূতের বোঝা

শ্রীকল্যাণী পাল

তাঁহার ইচ্ছায় যখন জগৎ চলিতেছে এবং তাঁহার ইচ্ছাব্যতিরেকে মানুষ যখন এক পা-ও ফেলিতে পারে না, তখন এ কথা ধরিয়া লইতে হইবে যে আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এক একটি নক্‌সা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা না হইলে আমার ন্যায় ভবঘুরে যে আবার কখনও সংসারী হইবে ইহা কে কবে ভাবিয়াছিল?

ভাবে নাই সত্য। কিন্তু তবুও আমি সংসারী হইয়াছিলাম, এবং কেমন করিয়া যে আমার ঐ ভবঘুরে জীবনটা পাকাপাকি ভাবে সংসারী হইয়া পড়িল, আজ সেই কথাই বলিব।

রামধন বাবুর সঙ্গে আমার পথের আলাপ। এমন ত' কত লোকের সঙ্গেই হইয়া থাকে; কিন্তু তবুও যেন মেলামেশাটা একটু অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, তা দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়াই বলুন, বা ভাগ্যচক্রে পড়িয়াই বলুন!

দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রথম আলাপ; এবং ইহারি দুই একদিন পরে হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ভদ্রলোক আমার কাছে আসিয়া হতাশভাবে বলিলেন—বড় সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল মশাই!

বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—চোখে মুখে তাঁর উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট। বলিলাম—ব্যাপার কি?

—আর ব্যাপার! এই বিদেশ বিভূঁই—এমন বিপদও মানুষের হয়! ভদ্রলোক হতাশ ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

একটা কিছু বিপদ হইয়াছে বুঝিলাম। কিন্তু কিসের বিপদ বা বিপদের গুরুত্ব কতখানি ইহা বুঝিতে পারিলাম না। কারণ বিপদের কথা কিছুই না বলিয়া ভদ্রলোক কেবলই হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার স্ত্রীর কলেরা হইয়াছে প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং সেই হইতে ইনি ছুটাছুটি করিতেছেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক্ করিতে পারেন নাই। এতক্ষণ রোগী বাঁচিয়া আছে, কি নাই, তাহাও বলিতে পারেন না। এত বড় বিপদে কি মাথা ঠিক রাখিতে পারা যায়!

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোককে লইয়া ডাক্তারখানায় গেলাম এবং কলেরার সাজ সরঞ্জাম সহ ডাক্তার বাবুকে লইয়া রামধন বাবুর বাড়ী আসিলাম।

ডাক্তার লইয়া আসিয়া আর এক বিপদ। ডাক্তার বাবু যাহা চাহেন বা বলেন, রামধন বাবু তাহাতেই থতমত খাইয়া যান, বলেন—আমি বড় 'নার্‌ভস্', আমি কিছু পারব না। অগত্যা আমাকেই রোগীর সেবা শুশ্রূষার ভার লইতে হইল। সারা রাত একই ভাবে কাটিয়া ভোরের দিকে রোগের একটু সুরাহা হইল। তখন রামধনবাবুর কাছে বিদায় লইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া অবধি মনের ভিতর কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে রামধন বাবু যাঁহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার না আছে সিঁথায় সিন্দুর, না আছে হাতে নোয়া—পরণে ত সাদা থান। ঠিক করিলাম আর ওখানে যাওয়া হইবে না। কিন্তু পরদিন বৈকালে রামধন বাবু আসিয়া যখন ধরিয়া বসিলেন যে সেদিনকার নৈশ-ভোজন তাঁহারি বাড়ীতে সমাপন করিতে হইবে—শুধু যে তিনি আসিয়াছেন এমন নহে পরন্তু রোগী নিজে ও মা নাকি বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন এবং না যাইলে অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন, তখন দু'একবার ওজর আপত্তি করিয়া ভদ্রতার খাতিরে শেষ পর্য্যন্ত না বলিতে পারিলাম না।

আহারে বসিয়া মা'র সস্নেহ বাক্যে তাঁহার প্রতি আমার আর শ্রদ্ধার অবধি রহিল না। এবং এই যে কিছু পূর্ব্বে ইহাদের সম্বন্ধে একটা কুৎসিত চিত্র মনের ভিতর আঁকিয়াছিলাম তাহার জন্য নিজেকে অপরাধী না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরিশেষে মা'র নিকট বিদায় লইতে গিয়া এই হইল যে প্রত্যহ একবার করিয়া আসিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিতে হইল।

সেই হইতে প্রত্যহ একবার করিয়া মা'র সহিত দেখা করিয়া আসিতাম।

এই ঘটনার বোধকরি বা, পনর দিন পরে একদিন রাত আটটার সময় গিয়া দেখি বাড়ীতে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। একটি বেঁটে মোটা-সোটা ভদ্রলোক চর্কির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং চীৎকারে সমস্ত বাড়ী মাথায় করিয়া যেন মহা-প্রলয়ের সূচনা করিতেছেন। একটু থতমত খাইয়া গেলাম। চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মা'-ই বা কোথায়, সরমাই বা কোথায়, আর কোথায় বা রামধনবাবু! কাহারও সাড়া শব্দ নাই—কেবল ঐ বেঁটে মানুষটির বিকট চীৎকারে সমস্ত বাড়ীটা গম্‌গম্ করিতেছে। এমন সময় মা'কে দেখিতে পাইলাম। প্রশ্নসূচক ভাবে চাহিতেই তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। ইহাতে ব্যাপারটা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। তবে নবাগত ভদ্রলোকটি যে 'কেউ কেটা' নহেন ইহা বুঝিতে পারিলাম। আর এমন একটা কিছু হইয়াছে যাহা আমার কাছে অপ্রীতিকর বলিয়াই মা বোধ করি বা এমন করিয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করাই উচিৎ। ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় আমার প্রতি ভদ্রলোকের নজর পড়িল। কহিলেন—কাকে খুঁজ্‌চেন মশাই?

কোন এক অপ্রীতিকর ঘটনার ভিতর জড়াইবার ভয়ে ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম—আজ্ঞে, একবার রামধনবাবুর কাছে এসেছিলুম!

ভদ্রলোক কহিলেন—মশায়ের কি দরকার জান্‌তে পারি কি?

বলিলাম—এম্‌নি পথে আলাপ হ'য়েছিল—আস্‌তে বলেছিলেন,—তা পরে দেখা কর্‌ব এখন।

ভদ্রলোক একবার চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—যখন এসে পড়েছেন তখন আমার একটা উপকার করে যান। আমি ঐ ছুটো মাগীকে তাড়িয়ে দিচ্ছি...আপনি 'আশ্চর্য্যি' হবেন...কিন্তু আশ্চর্য্যি হ'বার কিছুই নেই! দুটাই বেশ্যা! ভাইপোটা এদের নিয়ে ভেসে পড়েছিলো...অনেক কষ্টে সন্ধান পেয়েছি—আর কি ওদের এক মিনিটও এ বাড়ীতে থাক্‌তে দেওয়া উচিৎ? বলিতে বলিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং মুহূর্ত্তে দুইজনকেই বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। মা বা সরমার দিক হইতে কোন আপত্তিই আসিল না। রামধনবাবু যে কোথায় তাহাও কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। এবার ভদ্রলোক চেয়ারে জাঁকিয়া বসিয়া ও আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া কেমন করিয়া কি হইয়াছিল তাহারই ইতিহাস বলিতে বসিলেন।

কিছুক্ষণ শুনিয়া, বলা শেষ হইয়াছে ভাবিয়া যেমন উঠিয়াছি অমনি তিনি হাতটা চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় বসাইয়া দিয়া বলিলেন—বুঝ্‌লেন কিনা?...কিছুতে কি যেতে চায়! যেন কে কাকে বল্‌ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই! যাই হোক্ আপনি এসে পড়ে ভারী উপকার ক'রে গেলেন! লোকজন আস্‌ছে দেখে গুড়্ গুড়্ ক'রে বেরিয়ে গেলো—বুঝ্‌লেন না! বলিয়া আবার কি কতকগুলা গড়্ গড়্ করিয়া বলিয়া চলিলেন। যাহার সাধারণ অর্থ হইতেছে এই যে—সরমাদের বাড়ী তাঁহাদের বাড়ীর পাশে। সরমার চৌদ্দ বৎসর বয়সে স্বামী মারা যায়। উঁহাদের সেই কষ্টের সময়ে উঁহারা নাকি কিছু সাহায্য করিতেন। রামধনবাবুও লুকাইয়া লুকাইয়া কিছু কিছু দিতেন। তাহার পর এই যাত্তয়া-আসা করিতে করিতে সরমার সঙ্গে এই কুৎসিত ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ে। ইহাদের কাশীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রামধনবাবুর বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সংবাদ নাই। তাই অনেক করিয়া ইনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সব কথাও আমার কাণে পৌঁছায় নাই। তখন ভাবিতেছিলাম মা ও সরমার কথা। প্রথম

২

ইহাদের কাছে আসিয়া কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। কিন্তু মা'র সদয় ব্যবহারে ও স্নেহের স্বাদ পাইয়া অবধি কেমন একটা শ্রদ্ধা হইয়াছিল। ভাবিতেও পারি নাই যে যাঁহার হৃদয়ে এত স্নেহ, এত মায়া তিনি এমন একটা কুৎসিৎ ব্যাপারে জড়াইয়া থাকিতে পারেন। বুঝিয়াও বুঝিবার কোন চেষ্টা করি নাই। কিন্তু চোখের সামনে যখন এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল তখন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

ভদ্রলোককেও বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না! জানিয়া শুনিয়া কোন্ অভিভাবক এমন নারীকে ঘরে স্থান দিতে পারেন বা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পারেন। সুতরাং যাহা হইয়াছে তাহা ঠিক ই হইয়াছে। কিন্তু, তবুও যেন মন ইহাতে সায় দিতে চায় না। স্বীকার করিলাম ইহারা পাপী; সমাজের কাছে অনেক দোষ ইহারা করিয়াছে, কিন্তু এই যে নিশীথে নিঃসঙ্গ ভাবে দুইটি নারীকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল, সকল দোষই কি তাহাদের! ভাবিতে ভাবিতে মনটা কেমন করিয়া উঠিল, উঠিয়া পড়িলাম। ভদ্রলোক আবার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বুঝ্‌লেন কিনা?

বলিলাম—তা বৈ কি!

ভদ্রলোফ বুঝিতেও পারেন নাই যে আমি তাঁহার কোন কথাই শুনি নাই। 'তা বৈ কি' কথাটা শুনিয়া তাঁহার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আবার গড়্ গড়্ করিয়া কত কি কথাই বলিতে লাগিলেন

কোন মতে নিস্তার পাইয়া যখন বাহিরে আসিলাম তখন রাত দশটা।

রাস্তার ভীড় কমিয়া গিয়াছে। দুই একটা এক্কা গাড়ী সোয়ারির আশায় তখনও রাস্তার এক ধারে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। দুই একটা বা মন্থর গমনে এধার ওধার চলিয়া যাইতেছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া পড়িলাম। মনটা যেন অত্যন্ত গুমট। যতক্ষণ রামধনবাবুদের বাড়ী ছিলাম ততক্ষণ যেন বেশ ছিলাম। কিন্তু বাহিরে আসিয়া মা ও সরমার চিন্তা যেন বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিল। এম্‌নি ভাবিতে ভাবিতে নিচের সিঁড়ীর দিকে চাহিয়া দেখি—ঠিক জলের কাছাকাছি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে দুইটি নারী বসিয়া আছে। আনন্দে মনটা একবার নাচিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি নিচেয় নামিয়া ডাকিলাম—মা!

উভয়ে যেন একবার চমকিয়া উঠিল। আবার ডাকিলাম—মা! তথাপি নিরুত্তর। এবার কাছে গিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম—মাই বটে। বলিলাম—মা, আমি আপনার পেটের ছেলের মত, আমার কাছে আর লজ্জা করবেন না, চলুন আমার বাসায় চলুন। মা কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। এবার আর ধৈর্য্য রহিল না। বলিলাম—আপনার পায়ে পড়ি মা, আর কষ্ট দেবেন না, চলুন! মা উঠিলেন, কৃতজ্ঞ ভাবে কি যেন বলিতে গেলেন কিন্তু রুদ্ধ বেদনায় স্বর চাপিয়া গেল। সেই অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও বেশ বুঝিতে পারিলাম মা কাঁদিতেছেন।

মা ও সরমাকে লইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। এত রাত্রে দুইটি নারীকে সঙ্গে লইয়া আসিতে দেখিয়া পাণ্ডাজীর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কহিল—ই লোক কোন্ হায় বাবুজী!

বলিলাম—আমার মা আছে!

—আপ্‌কা মাই! টিসনমে আন্‌নে গিয়া! আরে বাবুজী হামকো আদেশ কর্‌লে সে সব বন্দ্‌বস্ত ইত্যাদি!

কোন রকমে হাঁ হুঁ দিয়া উপরে চলিয়া আসিলাম।

আমার ঘর খানি বেশ নিরিবিলি। ত্রিতলের উপর এই একখানি মাত্র ঘর ও একটি রান্নাঘর, বাকি সমস্তটা ছাদ।

তখন রাত অনেক হইয়া গিয়াছে। মা ও সরমাকে এক ধারে শুইতে দিয়া আমিও এক ধারে শুইয়া পড়িলাম।

সরমার একটা ধাক্কা খাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। সরমা কহিল—খুব ঘুমাচ্ছেন ত! এ দিকে যে বেলা দশটা হ'য়ে গেল! নিন্ উঠে হাত মুখ ধুয়ে, চান্ টান্ করে খাবেন আসুন!

বলিলাম—খাব! মানে?

সরমা কহিল—খাবেন তার আবার মানে কি? ভাত তরকারি সব তৈরী হ'য়ে গেছে—শিগ্‌গীর উঠুন।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া রান্না ঘরে গেলাম। ভোজন করিতাম হোটেলে, সুতরাং এ ঘর কোন দিন ব্যবহার করি নাই। আজ কিন্তু এ ঘর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম—এ সব যোগাড় কর্‌লে কোত্থেকে সরমা!

সরমা হাসিয়া কহিল—চেষ্টা কর্‌লেই হয়।

বলিলাম—মা কোথা?

সরমা কহিল—মা সেই সকালে বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছেন। আর গল্প করে কাজ নেই, যান্ চান করে আসুন।

মনটা ভারী খুসী হইয়া উঠিল। এ যেন আমার ভবঘুরে জীবনে একটা 'পরব' আসিয়াছে। মনের আনন্দ আর চাপিতে পারিলাম না—মুখে শিস্ দিতে লাগিলাম, কখনও বা ছেলে মানুষের মত গুণ্‌গুণ করিয়া গান ধরিলাম।

আজ ইহাদের কাছে পাইয়া সংসারের অভাব যেন বেশী করিয়া অনুভব করিলাম। তাই ইহাদের লইয়া আবার একবার নূতন করিয়া সংসার বাঁধিবার বাসনা মনে হইতেই আপনা আপনি চমকিয়া উঠিলাম। ভাবি, এ যে ক্ষণিকের আলো—ইহা আঁধারকে গাঢ় করিয়া তুলিবে মাত্র। কিন্তু এই ক্ষণিক আলোও ত' মানুষ চায়।

আহারাদির পর শুইয়া শুইয়া এমনি দোটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছিলাম। এমন সময় সরমা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—চোখ বুজে কি ভাব্‌ছেন?

ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—এই তোমার কথাই ভাবছিলাম।

একটু বিস্ময়ের সহিত সরমা কহিল—আমার কথা? পরক্ষণেই মৃদু হাসিয়া কহিল—তবু ভাল যে আমার কথাও লোকে ভাবে! যাক্ অমার কথা আর ভাব্‌বেন না,—শেষে আমার চিন্তায় না আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়।

সরমা শেষের কথাগুলা সামান্য পরিহাসের ছলে বলিলেও কথাটা আমি অন্য ভাবে লইয়া বড়ই অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলাম। একে ত' তাহার কথা ভাবিতেছিলাম প্রকাশ করিয়া আপনিই মরমে মরিয়া যাইতে ছিলাম, তাহার উপর সরমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া হঠাৎ এই কথাই মনে উঠিল বুঝি বা ধরা পড়িয়া গিয়াছি। লজ্জায় কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। রাগিয়া আপনাকেই আপনি ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল সরমার উপর। যদি বা একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি কিন্তু তাহা লইয়া কি খোঁচা দেওয়া উচিৎ! কাল যাহার মাথার উপর দিয়া অতবড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, সে কেমন করিয়া এমন আনন্দে দিন কাটায়! মনের কোণে কথাটা উঠিবা মাত্র বিরক্ত ভাবে ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—তা খুব হ'য়েছে! তোমার হাস্‌তে, কথা কইতে একটু লজ্জা করে না? কাল তোমার অমন একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল,—আর তুমি হাস্‌ছ! ছিঃ।

এবার সরমার মুখ চুণ হইয়া গেল। শুষ্ক ভাবে কহিল—আমি ত' আপনাকে কিছু খারাপ কথা বলি নি।

তারপর সরমা আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

শুইয়া শুইয়া আবার সরমার কথা ভাবিতে লাগিলাম। যতই কথাগুলাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম, ততই আপনার প্রতি আপনি রাগিয়া অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলাম। কি বা এমন হইল যে অমন কটুক্তি করিলাম। জগতে উহার আছেই বা কি? স্বামী, পুত্র, অর্থ কিছুই নাই। তাহাই ভাবিয়া ভাবিয়া জীবনটা ব্যর্থ করার চাইতে যদি আপনার আনন্দে আপনি হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে পারে, মন্দ কি! আর তাহা লইয়া খোঁচা দিবার আমারই বা কী অধিকার আছে। নিজের উপর রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল।

দিন যায়। দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল।

সে দিন দেহটা আমার ভাল ছিল না। চুপ করিয়া শুইয়া ছিলাম। আর সরমা আমার শিয়রে বসিয়া

মাথাটায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। মা একটু দূরে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। এমন সময় রামধনবাবু আসিয়া হাজির। তাঁহার এই আকস্মিক আগমনে সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। মা যেমন মালা জপ করিতেছিলেন বোধ করি বা তেমনি-ই মালা জপ করিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না। সরমা যতই আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল ততই তাহার হাত বারম্বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অগত্যা আমাকেই আহ্বান করিতে হইল। কহিলাম—এই যে রামধনবাবু, আসুন!

রামধনবাবু একেবারে আমার কাছে আসিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া গদগদভাবে কহিলেন—আপনি যা আমার উপকার করলেন তা আর কি বলে জানাব! আপনি না থাক্‌লে কি আর এদের ফিরে পেতাম ইত্যাদি ইত্যাদি!

কৃতজ্ঞতার পালা শেষ করিয়া এইবার কুশল সমাচার, কয়খানি ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছে ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এবং যেমন শুনিলেন যে ঐ একমাত্র ঘর—উপরি একধারে আমি ও অপর দিকে মা ও সরমা শুইয়া থাকে অমনি তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল।

অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে একগৃহে কোন যুবতী বসবাস করিতেছে শুনিলে ভাবান্তর হইবারই কথা! কিন্তু এই কথাটা যখনই ভাবি যে, যে অপ্রিয় ঘটনার আশঙ্কায় রামধনবাবু এমন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, তিনিই সেই অপ্রিয় ঘটনার নায়ক—অথচ আত্মীয়তার দিক দিয়া দেখিতে তিনি ও আমি উভয়েই সমান—তথাপি অতি বড় আত্মীয়ের মত ভবিষ্যতের কোন এক অহৈতুক ঘটনার কল্পনায় এমন করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তখন আর না হাসিয়া পারি না!

যা হোক্‌, যাইবার সময় রামধনবাবু সরমার হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া গেলেন যে দু'এক-দিনের ভিতর আসিয়া তিনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর ঘন ঘন যাওয়া আসা চলিতে লাগিল; এবং এই ব্যবস্থা করা লইয়া নিত্যই সরমাদের সহিত কলহ হইতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখি মা একদিকে চুপ করিয়া শুইয়া আছেন এবং সরমা দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া আছে। ইতিপূর্ব্বে একটা কলহ হইয়া গেছে বুঝিলাম। কিন্তু কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। নিজের শয্যায় গিয়া শয়ন করিলাম।

এই ভাবে থাকিতেও যেন আর ভাল লাগিতে ছিল না। ইহাদের কাছে থাকিয়াও ইহাদের বিষয়ে কোন কথা কহিবার আমার অধিকার ছিল না। আজ যদি রামধন বাবুকে কোন কথা বলি এবং কাল যদি তিনি অর্থ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন ত' ইহাদের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না। ইহাদের লইয়া আসিয়াছি সত্য কিন্তু কোন দিন এক পয়সাও দিয়া সাহায্য করিতে পারি নাই। নিজেদের যাহা কিছু ছিল তাহাতে এতদিন চালাইয়া আসিয়াছে, আর এখন রামধনবাবু ভিন্ন গতি নাই!

পরদিন তাই চাকুরির অন্বেষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম।

এম্‌নি অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া যে দিন মাসিক ২০৲ টাকা বেতনের কোন এক কাপড়ের দোকানে চাকুরি পাইলাম, সেদিন আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

ছুটিয়া আসিতেছিলাম মা ও সরমাকে সম্বাদটা দিবার জন্য। কিন্তু সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে আমাকে লইয়া তুমুল কলহ হইতেছে শুনিয়া থমকিয়া গেলাম।

রামধনবাবু আমাকে ও সরমাকে লইয়া তীব্র কটূক্তি করিতেছিলেন, এবং ইহার জন্য মাকেই দায়ী করিতেছিলেন।

একবার ভাবিলাম যাই, উঠিয়া যাই, আবার ভাবিলাম না যাওয়াটা শোভন হইবে না,—মা ও সরমা হয়ত' বড় অপ্রস্তুতে পড়িয়া যাইবে। যাইব কি না, ভাবিতেছি এমন সময় সরমার কথা কাণে ভাসিয়া আসিল।

সরমা বলিতেছিল—তাই চল মা, তাই চল। উনি যখন নিয়ে যেতে চাইছেন, তাই চল। আর ঝগড়াঝাটি

পারা যায় না! সুরেন দা'র বরাতে যা আছে তাই হ'বে। ভেবে আর কি হ'বে মা! যা করেছি তার ত' আর উপায় নেই—না হ'লে যে পথে দাঁড়াতে হ'বে! আর সুরেনদাই যে কেমন লোক কে জানে?

কতক্ষণ যে পথে পথে ঘুরিলাম তাহার ঠিক্ নাই; যখন হুঁস্ হইল তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখি মা শুইয়া পড়িয়াছেন। সরমা আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে ইহা পূর্ব্বেই ঠিক্ করিয়া ছিলাম। সুতরাং আমার জামা কাপড় লইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই সরমা আসিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—এত রাত্রে আবার কোথায় যাচ্ছ!

বলিলাম—যেখানেই হোক্ যেতে ত' হবে সরমা!—আগে যাওয়াই ভাল. মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

সরমা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—কি যে পাগলের মত বক্‌ছ তার ঠিক্ নেই! আজ হঠাৎ কি হোল বল ত'?

বলিলাম—কিছুই হয় নি সরমা। তোমাদের কাছে আর থাকা হ'তে পারে না। রামধনবাবুর কাছেই তোমরা যাও,—সেই ভাল!

সরমা এবার কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—অ, আমাদের ঝগড়ার কথা তুমি শুনেছ! কিন্তু আমার কথা কি একটি বারও ভেবে দেখেছ! তোমরা সবাই মিলে এমন করলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

চমকিয়া উঠিতে হইল।

সরমা আবার কহিল—যাবে যাও, কিন্তু আজ নয়। আজ খাবে চল। তারপর কাল খেয়ে দেয়ে যেখানে খুসী যেও।

আহারে বসিলাম, কিন্তু রুচি ছিল না। কোন মতে দুই এক গ্রাস তুলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এবং তাড়াতাড়ি গিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু ঘুম আর আসে না। একটু তন্দ্রা আসিয়া পরক্ষণেই ভাঙিয়া যায়! উঠিয়া বাহিরে গেলাম আবার আসিয়া শুলাম। এমনি করিয়া সারারাত কাটিয়া গেল।

ভোরবেলা মা উঠিয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন। সরমা হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা তৈয়ারী করিয়া আনিয়া দিল।

মা আসিয়া কহিলেন—ওরে বাবা সুরেন, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

মা'র মুখের দিকে চাহিলাম।

মা বলিলেন—এমন করে আর কদিন চল্‌বে বল দিকি! ওকে ছাড়্‌লে না খেতে পেয়ে মারা যেতে হ'বে। আর না ছাড়্‌লে শেষে মেয়েটার দুর্গতির আর সীমা থাক্‌বে না। যা হয় একটা কর বাপু! তোকে পেটের ছেলের মত ভাবি, তুইও যদি রাগ করে চলে যাস্ তো আমরা কোথায় দাঁড়াব রে!

বড়ই অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলাম, বলিলাম—মা মা, না, আপনাদের ছেড়ে কোথাও যাব না। আর রামধন বাবুর কাছ থেকে টাকা নিতে হবে না; আমি একটা চাকুরি জোগাড় করেছি, মাসের এই কটাদিন শেষ হ'লে কাজে বেরুব। সরমাকেও হাতে নাতে একটা কাজ শেখাব, যাতে দুপয়সা হয়, তা হলেই আমাদের চলে যাবে। পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ায় বলিলাম—হ্যাঁ, আর একটা কথা! সরমার বে দেবে মা? তা হলে ল্যাঠা চুকে যায়।

মা হাসিয়া কহিলেন—পাগল ছেলে। বিধবা মেয়ের কি আর বিয়ে হয় রে! পাঁচজনে বলবে কি?

বলিলাম এতেই কি পাঁচজনে ভাল বলছে মা! বে হ'লে না হয় লোকে ছি ছি করবে, কিন্তু এতে যা বলে তা শুন্‌লে যে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়! তারপর এখন রামধনবাবু যা করছেন, বে হলে ঠিক তেমনি কি আর করবেন? তখন কোথায় দাঁড়াবে? তার চেয়ে কি বে দেওয়া ভাল নয়। আর তুমিই বা কতকাল বাঁচবে।

মা বলিলেন—কিন্তু লোকে বিধবা মেয়ে বিয়ে করে' ঠিক্ তেমন ভাবে গ্রহণ কর্‌বে কেন?

বলিলাম, করবে মা করবে। না পারলে দেব কেন?

মা বলিলেন, বেশ বাবা, যা ভাল হয় কর। আমি আর ক'দিন। সরমার মত থাকে, দাও।

উভয়েই সরমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু

সরমা সেখানে নাই, বিবাহের কথায় অন্তরে চলিয়া গিয়াছে।

বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া মা ও আমি গঙ্গা স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে মা বিশ্বনাথ দর্শনে গেলেন, আমি বাসায় ফিরিলাম।

আহ্নিকও জপ সারিয়া, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ফিরিতে বেলা বারটা সাড়ে বারটা হইত। আহারাদি সারিয়া শুইয়া আছি, মা না আসা পর্য্যন্ত সরমার ও কোন কাজ ছিল না, ডাকিয়া কহিলাম—শোন সরমা!

সরমা আসিয়া আমার পায়ের তলায় বসিয়া পা'য়ে আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কহিলাম, সব শুনেছ ত'?

সরমা নিরুত্তর!

পুনরায় কহিলাম, বিবাহে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে ত' শীগ্‌গির কাজটা শেষ করে ফেলি—একটা ঝঞ্ঝাট চুকে যাক্।

সরমা কহিল মাপ কর, আমি আর বিয়ে কর্‌তে পার্‌বনা। তোমরা যদি আমার এক মুঠো খেতে দিতে না পার. ত দাসী বৃত্তি করে আমি আমার একটা পেট চালিয়ে দোব, আর কারো হাতে আমায় তুলে দিতে হ'বে না।

সরমার চোখ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বলিলাম, তাতে তো তোমার বিপদ কাটবে না সরমা! তোমার সিঁথায় সিন্দুর না ছোঁয়াতে পার্‌লে তোমার পথ এমনি দুর্গম থাক্‌বে!

সরমা কোন কথা কহিল না, তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে ছিল। কহিল, তুমি কি এক মুঠো ভাত আমায় দিতে পার্‌বে না?

বল্লিলাম, এক মুঠো কেন সরমা! তোমার জন্তই আবার আমি চাক্‌রি করতে বেরিয়েছি, আবার আমি সংসারী হ'ব! কিন্তু তার আগে সম্বন্ধটা ঠিক করে নিতে চাই।

সরমা বারবার মাথাটা আমার পায়ে ঠেকাইয়া সাশ্রু-নয়নে কহিল, তুমি কি এ কলঙ্কিনীকে চরণে স্থান দেবে?

সে দিন বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিয়া দেখি রামধনবাবু বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই রামধনবাবু কহিলেন, এই যে সুরেন বাবু! অপিনার জন্যে বসে আছি। সরমা ত তাড়িয়েই দিলে। বলে—আর তুমি এস না। আমি বলি, বেশ ত' আর না হয় আসব না, কিন্তু একদিন যখন মালিক ছিলাম এবং এখনও যখন মালিকানা স্বত্ব হারাইনি, তখন একেবারে কি তাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। আর বিয়ের সময় আস্‌তে পারব কি না জানিনা—তখন আজ যদি একপাত লুচি খাইয়ে দাও তো তোমাদের শুভ কামনা কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী যাই। কি বলুন, সুরেনবাবু. কথাটা কি মন্দ বলেছি! বলিয়া জোর করিয়া শুক্‌নো হাসি হাসিতে লাগিল।

কি বলি!—বলিলাম বেশত! বেশত! আজ এখানে খেয়েই যাবেন।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ শুনা গেল। উভয়েই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম রামধন বাবুর সেই বেঁটে খুড়া মহাশয়টি আসিতেছেন। ভয়ে আমাদের বুক শুকাইয়া গেল! আর রামধন বাবুর ত' কথাই নাই!

খুড়া মহাশয় আসিয়া কহিলেন—কিগো বাবুজী, নিজেকে খুব চালাক মনে কর না? কিন্তু বাবা, দেখে দেখে চুল পেকে গেল! বলি, এত রাঁধুনি বামুন থাকতে রামাকে রেখে গেলুম কেন! হু হু বাবা! আমি যে জেনেই ছিলাম যাক্ এখন সুপুত্তুরের মত উঠে এস দিকি। কৈগো—বলিয়া পিছন ফিরিয়া আমার দিকে নজর পড়িয়া গেল। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিলেন, আরে আপনি! ওঃ আপনি! রামধন চলে এস, চলে এস বলিয়া এমন এক ভীষণ হুঙ্কার ছাড়িলেন যে রামধনবাবু উঠিয়া যাইতে পথ পাইলেন না।

সিঁড়ীতে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিলেন, ভয় কি

বাবাজী, পাশের বাড়ীটা খালি আছে এইখানেই তোমায় এনে দোব।

সত্য সত্যই দুই-একদিন পরে রামধন বাবুরা পাশের বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। এবং ইহারি দুই একদিন পরে শঙ্খ ও উলুধ্বনির শব্দ আসিয়া খুড়া মহাশয়ের পাশের বাড়ী আসার অর্থ জ্ঞাপন করিল।

সে দিন সারাদিন ও-বাড়ীতে আনন্দোৎসব চলিতেছিল। সরমার মনটা মোটেই ভাল ছিল না। মা সারা দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া দিলেন। দুপুরে একবার মাত্র বাড়ী আসিয়া আবার সেই তিনটা বাজিতেই বিশ্বনাথ দর্শনে চলিয়া গেলেন। আমিও বৈকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় রামধনবাবু মদ খাইয়া টলিতে টলিতে আসিয়া কহিলেন—আজ আমার বে সরমা। তোমাদের সব নিমন্ত্রণ। তুমি যেও সরমা'—না গেলে আমার ভারি কষ্ট হবে। রামধনবাবুর চোখের কোণ হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। চোখ মুছিতে মুছিতে রামধনবাবু আর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমারও মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল। বাহির হইয়া গেলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া গেলে ঘরে আসিয়া দেখি, তখন প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। পকেট হইতে দেশলাই লইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখি সরমা এক কোণে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে। কাছে বসিয়া মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইতে গিয়া দেখি নয়ন জলে গণ্ডদেশ ভাসিয়া গিয়াছে।

সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলাম—কেঁদে কি করবে সরমা! পুরাতন স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে জীবনের নূতন পথে এগিয়ে চল

সরমা কোন কথা বলিল না, কেবল ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল—আমায় ক্ষমা কর! ছোট 'বোন্‌টি' বলে কি আমায় স্থান দিতে পার না? বলিয়া আমার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া তাহার অশ্রুজলে পদদ্বয় ধৌত করিতে লাগিল।

আমার আশার স্বপ্ন টুটীয়া গেল। কল্পনায় যে প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সরমাকে তুলিয়া বলিলাম—তাই হবে সরমা

মনের বোঝা ভুতে বয়।

রামধনু

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

আমার ঘরের জানালাটি মেলিলেই নিত্যকারের যে অপরিসর আকাশটুকু আর যে-কয় মুঠি পুরাণো নক্ষত্র চোখে পড়ে, আজ মনে হয়, তাহা লইয়া অনায়াসে কবিতা রচনা করিতে পারি। প্রতিটি তারকা-প্রসবের বেদনায় আকাশের রঙ্ কেমন করিয়া বদ্‌লাইয়া যায়, প্রতিটি নক্ষত্রের মৃত্যু-মুহূর্ত্তে তাহার নীলবুক কেমন করিয়া দুলিয়া ওঠে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

আর পারি, আমার এই স্বচ্ছ প্রায়ান্ধকার ক্ষুদ্র গৃহ-কক্ষটিকে একটি অনায়াস স্বর্গ কল্পনা করিতে, অদূরভবিষ্যতেই যেখানে ললিতার প্রতিটি ললিত পদপাতে নবপারিজাত জন্মলাভ করিবে। পৃথিবীর কোনও মানুষের প্রতি আর একতিল ঈর্ষ্যা নাই; সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য—কোনোকিছুর জন্তই নহে। মনে করিতে পারি, আমি আজ হঠাৎ হিমালয়ের তুষারশুভ্র সুউচ্চ শিখরে উঠিয়া আসিয়াছি, হয়তো তাহারও উপরে—শতসূর্য্যের জ্যোতির্লোকে; পাশে আছে ললিতা; পৃথিবীর সকল মানুষ আমাদের পায়ের তলায় উর্দ্ধমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জীবনের পান-পাত্র ভরিয়া এতদিন যে-বিষ প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনকে ফুরাইয়া ফেলিবার পথে প্রলোভিত করিতেছিল, আজ সন্ধ্যায় ললিতার একটিমাত্র সস্মিত সম্মতিতে তাহা সুধা হইয়া উঠিয়াছে। সে-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া আমি অমরত্ব লাভ করিয়াছি। আজ আর কিছু ভাবিতে পারি না। পৃথিবী যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আমার চোখের একটিমাত্র দৃষ্টির পথে স্থান সঙ্কুলান করিয়া লইয়াছে, আমার জানালার ওই আকাশ-খণ্ডটুকুর মধ্যেই যেন সমস্ত আকাশটা মাথা গুঁজিয়া ঠাঁই লইয়াছে। আজ আর কেহই নাগালের বাহিরে নয়, আমার হাতের মুঠিতে, আমার দৃষ্টির সীমায় সবাই আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ললিতাকে তো জানি ছোটবেলা হইতেই, যখন সে ফ্রক্ পরিয়া লাট্টুর মতো ঘুরিয়া বেড়াইত! কিন্তু ঐ 'জানি'র পেছনে ছুটিয়া ছুটিয়া হয়রাণ হইয়া আরো বেশী জানিবার আগ্রহ আমার কোনোদিন হয় নাই। আসলে ললিতাকে ঘিরিয়া প্রেমে-পড়ার লক্ষণগুলি আমার মধ্যে একদিনও ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। একটা সাদাসিধা মেয়ে, ইস্কুলে যাইবার সময় কতদিন কাঁদিয়া পাড়া মাৎ করিয়াছে, লাটিম ছুড়িতে গিয়া মর্‌জি মাফিক্ সহপাঠির মাথা ফাটাইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে, আমাদের সরুগলিটার এ-পাশের বাড়ির রক্ হইতে ও-পাশের রকে লাফাইয়া পড়িয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছে,—সে কবে বড় হইল, শান্তশিষ্ট হইল, চোখের তারা দুটিতে তার নীল-আকাশের গাঢ়তার স্পর্শ লাগিল, কবে সেই ছোট্ট দুষ্টু মেয়েটা নবোদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীতে পরিণত হইল, এতদিন বসিয়া বসিয়া আমি কেবল তাহারই হিসাব রাখিব, নিজেকে কেহই এতখানি অকর্ম্মণ্য ঠাওরাইতে পারে না।

কিন্তু কে জানিত এমন হইবে? বয়স যে এতদিন আমারো বাড়িয়া চলিতেছিল, সে কথা হঠাৎ সেদিন মনে পড়িয়া গেল। সেদিন রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত জুডোভিচিকে লইয়া কাটাইলাম, পৃথিবীর রঙ্ তখন আমার চোখে ধীরে ধীরে বদ্‌লাইতে সুরু করিয়াছে। পরদিন হইতেই অন্যান্য লক্ষণগুলিও বেশ দ্রুত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, অর্থাৎ যে দেয়াল-আয়নাটার পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন প্রতিবারে অন্ততঃপক্ষে পনেরো মিনিট করিয়া সময় ব্যয়

হইত, সেটার উপর বেশ মোটা হইয়া ধূলা পড়িল, জামা-কাপড়, ওয়াটার-প্রুফ্, ওয়াকিং-স্টিক্ প্রভৃতি রোজ একটা-না-একটা হারাইতে লাগিল (অবশ্যি মা, কিম্বা স্বরুচি কিছুদিন পরে সেগুলোকে খাটের তলা, মশারির উপর, এমনি এক একটা আজ্‌গুবি জায়গা হইতে আবিষ্কার করিত) ইত্যাদি।

দিনকয়েক পরে বড়দা'র আলমারীর এক গাদা ধূলার তলা হইতে শোপেন্‌হাওয়ার খানা আবিষ্কার ও পরিষ্কার করিয়া নিবিষ্টচিত্তে ছাদের এককোণে গিয়া পড়িতে বসিলাম, জীবনের যেন এক নতুন স্বাদ, নতুন অনুভূতি!

হঠাৎ ভেঁপু বাজাইয়া লরেটোর গাড়ীটা আমাদের গলির মোড়ে আসিয়া থামিল এবং শোপেন্‌হাওয়ারের বইটা হাতে থাকা স্বত্ত্বেও একবার সেদিকে না তাকাইয়া পারিলাম না। দেখিলাম, দুই হাতের অঞ্জলিতে এক গাদা বইখাতা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ললিতা মন্থরপদে নামিয়া পড়িল, গাড়িটাও অদৃশ্য হইয়া গেল।

এ দৃশ্য যে কতদিন দেখিয়াছি, তাহা মনে করিয়া রাখা কোনদিন দরকার মনে করি নাই; কিন্তু আজ যখন সত্যই শোপেন্‌হাওয়ারের শিষ্য হইতে চলিয়াছি, তখনই কি আজ মনে পড়িয়া গেল যে, ললিতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে আরো খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়? হায় দুঃখবাদি! তোমার মন্ত্র লইয়া কি চিরদিন এমনি বিদ্রূপ চলিবে?

বইটা একপাশে খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সেখানেই সটান হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

একটু পরে ললিতা আসিল। স্বরুচি শ্বশুড়বাড়ি চলিয়া যাওয়াতে ওর সম্প্রতি সঙ্গীর অভাব ঘটিয়াছে, তাই মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে, যদিও মার কাছেই ওর উপদ্রব-গুলি নির্ব্বিবাদে চলে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, কলেজ থেকে ফিরেই হঠাৎ যে? মাকে নীচে খুঁজে পেলে না বুঝি?

ললিতা সে কথার কোনও জবাব না দিয়া পার্শ্বস্থিত পুঁথিখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, এসব বাজে বই বুঝি আজকাল পড়েন আপনি?—ভালো লাগে আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, ভালোই লাগে।

না, না, কক্‌খনো ভালো লাগ্‌তে পারে না। (কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই যেন একটু আশঙ্কার আভাস ফুটিয়া উঠিল।) এ-সব বই পড়্‌বে কারা?—যারা শোপেন্‌হাওয়ারের মতোই হতভাগ্য, যারা পৃথিবীর কাছ থেকে কোনো কিছু পায়নি বা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করেনি। পেসিমিসম্ একটা পোজ্ ছাড়া কিছুই নয়। যারা নিরুপায়, তারাই ঐ পোজ্ নিয়ে থাকে।

অবাক্ হইলাম বলিলে হয়তো ঠিক বলা হয় না, দস্তুর মতো চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সেইদিনের ললিতা, সেও শোপেন্‌হাওয়ার পড়িয়াছে, পড়িয়া বুঝিয়াছে এবং ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে! আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, যোগ্যতার কোনো পরিচয় যখন আজো পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি, তখন কেমন ক'রে বলি যে, যোগ্যতা অর্জ্জন করেছি? কিন্তু সত্যি কি তোমার মনে হয় ললিতা, পৃথিবীর কাছ থেকে আমি কিছু পাবার যোগ্যতা রাখি? (যাহা কোনো দিন হয় নাই, আজ ললিতার সঙ্গে কথা বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলাম!)

ললিতা চকিতে আমার চোখের উপর একবার তাহার স্থির দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল, আপনার যোগ্যতাকে তো আপনি কোনোদিন যাচাই করে দেখেননি।

মনে মনে বলিলাম, যাচাই করিয়া দেখি নাই বটে, আজ দেখিব।

চোখের উপর দেখিলাম, কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ললিতার মুখের রঙ্ এক মুহূর্ত্তের জন্য বদলাইয়া গেল। সেটাকে একটা পরম শুভলক্ষণ মনে করিয়া প্রচণ্ড সাহসে তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিলাম এবং তারপর যাহা বলিলাম, তাহা আর একটুও মনে

নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি, ললিতা সে-কথা শুনিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই, বরং মাথা নীচু করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সেটা রাগের লক্ষণ, কি অনুরাগের লক্ষণ তাহা আপনারাই বিচার করিবেন। তবে, শোপেন্‌হাওয়ারকে সাক্ষী রাখিয়া এইমাত্র যে-কাণ্ডটা হইয়া গেল, তাহাকে বোধ হয় জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য বলা যাইতে পারে!

তারপর দিন কাটিতে থাকে। কিন্তু কেমন করিয়া এবং কোথা' দিয়া কাটিয়া যায়, তাহা আর খেয়াল থাকে না। শুধু মনে হয়, দিনগুলি যেন আগের চেয়ে অনেক খাটো হইয়া গেছে।

ললিতা বলে, আমারো তাই মনে হয়। দিনের বেশির ভাগই তোমাদের বাড়িতে কাটে, অথচ মনে হয়, সে আর কতটুকু সময়।

একটু হাসিয়াই জবাব দিই, এখন তা' মনে হয় বটে; কিন্তু বোশেখ মাসের সতেরো তারিখটা পেরিয়ে গেলে যখন তোমাকে আমাদের বাড়িতেই পাকা হয়ে থাক্‌তে হবে, তখন আর একথা মনে হবে না।

ললিতা চক্ষু দু'টি ঘুরাইয়া কৃত্রিম-ক্রোধের সহিত বলে, বেশ, হবে না তো হবে না। তুমি তো তা'হলে খুসীই হও।

বলিলাম, তুমি খুসী হ'লে আমি খুসী না-হ'য়ে আর কি করি বলো? কিন্তু শোপেন্‌হাওয়ার খানা তুলে' রেখেছি ললিতা, আবার সেখানা নামাতে হয়, এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছে নয়। তার চেয়ে এসো, তোমার এলো খোঁপাটা একটু আদর করে' খুলে দিই, তবু একটু কবিত্ব হবে যা'হোক্—

ললিতা তাড়াতাড়ি বন-হরিণীর মতো পলাইয়া যাইবার আগেই (বাঙালী হইলেও এক্ষেত্রে) মুখের কথাটি কার্য্যে পরিণত করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম। ততক্ষণে মুখরা প্রিয়ার মুখে হাসি এবং কথার খৈ ফুটিতে সুরু করিয়াছে,—আমি নাকি ভারি অসভ্য, এসব দুষ্টুমি কোথা হইতে ও কাহার কাছে শিখিলাম, এবং এসব নাকি মোটেই ভালো ছেলের লক্ষণ নয়!

আমাকে কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হইল যে, নিতান্ত গুড্-বয়্ গোছের ছেলেরাও প্রেমে পড়িলে অনেক কিছু শিখিয়া ফেলে এবং তাহা কাহারো কাছ হইতে শিখিতে হয় না। তা'ছাড়া যে-সব ছেলের হাত হইতে শোপেন্‌হাওয়ার কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহারা তো ফিউরিয়্যস্ হইয়া উঠিবেই।

ললিতা কিন্তু সেসব কথায় কাণ না দিয়া—ইচ্ছা করিয়াই কাণ না-দিয়া বলে, কাল কিন্তু প্যালেসে ভীটাফোন্ দেখ্‌তে যাবো, 'আয়র্‌ন্ মাস্‌ক্' হচ্ছে, ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ নেবেছে। ইলা আর সুষমা দেখে' এসে আজ কলেজে খুব প্রশংসা করছিল।

বলিলাম, বেশ তো, সাড়ে ন'টার শো'-তে যাওয়া যাবে 'খন। তারপর সিনেমা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্‌সিতে ক'রে কিছুক্ষণ নদীর ধারে বেড়ানো যাবে—

ললিতা চোখ বাঁকাইয়া বলে, ইস্, সখ্ ছাখো না ছেলের। না, না, ও-সব হবে-টবে না—

বলিলাম, বেশ তা'লে হবে না।

বলিলাম বটে, কিন্তু আমি জানিতাম এ-কথাটা প্রপোজ্ না-করিলেও হইত এবং এখন যে ললিতা বলিল 'হবে-টবে না', তবুও হইবে। সিনেমা হইতে বাহির হইলে ললিতাই তখন আবার বায়না ধরিয়া বসিবে। এটুকু যদি বুঝিতে না পারিলাম, তবে প্রেমে-পড়াটা আমার শুধুই বিড়ম্বনা হইয়াছে!

দিনগুলি আগের চেয়ে অনেকটা খাটো হইয়া গেছে মনে হইলেও, বৈশাখ মাসটা আসিতে নাকি বেজায় দেরি করিতেছে।—ললিতা প্রায়ই এই অভিযোগ করিয়া থাকে, কিন্তু কাহার কাছে করে, সে-কথা তাহার কথায় বড় একটা বুঝা যায় না। তা'ছাড়া আমি নাকি আজকাল পাল্লনের

বাইরে চলিয়া গেছি—যেহেতু আমি 'অনেক জায়গায়' আড্ডা দিয়া বেড়াই। ইঙ্গিতটা এইরূপ,—যেন বাংলাদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকদের প্রতি ড্রয়িং-রুমের দরজা আমার জন্য হাঁ করিয়া আছে এবং তাহাতে আমার মতো 'পর-মুখো' মানুষ একবার প্রবেশ করিলে আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে পারিবে না! কাজেই বুঝিলেন তো আমার অবস্থাটা ?

এমনি সময়ে একদিন কাকিমা ডাকিয়া বলিলেন, সুরুচিদের বাড়ি তোকে একবার যেতে হচ্ছে খোকা। অনেক চিঠি লেখালেখির পর কিছুদিনের জন্য ওকে ওর শশুর এখানে দিতে রাজি হয়েছেন। এবার গিয়ে ওকে নিয়ে আয়—

সুরুচি আমার মেজো কাকার মেয়ে। দুই বছর হইল বিবাহ হইয়াছে এক পল্লীগ্রামে। স্নেহময় জমিদার শশুর এই সুদীর্ঘ দুই বছরে একবারো তাহার একটিমাত্র পুত্র-বধূকে কাছ-ছাড়া করিতে পারেন নাই। আর এমনি মেয়ে এই সুরুচি—সে এই দুই বছরের মধ্যে একটিবারও লিখিতে পারিল না যে, যাহাদের মধ্যে এতকাল সে মানুষ হইয়া গেছে, তাহাদের কে কেমন আছে এবং তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা তাহার ভুলেও কোনোদিন হইয়াছে কিনা!

কাকিমা বলেন মিথ্যা নয়—পরের বাড়ি গেলেই মেয়ে পর হইয়া যায় এবং এমন পরই নাকি হইয়া যায় যে, সেকথা বলিতে গিয়া কাকিমার শুধু চোখের জলই আসিয়া পড়ে।

কাজেই এর পরে আর কাকিমার কথায় অমত করিবার সুযোগ থাকে না তা'ছাড়া সুরুচির উপর আমারও রাগটা কিছু কম ছিল না। এখানে থাকিতে যে-ছোড়্‌দা'র জন্য দুষ্টু মেয়েটার দরদের আর অন্ত ছিল না, সে কেমন করিয়া সুদীর্ঘ দুই বছর তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিল, সে কথাটা ওর কাণটি মলিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

তবে অসুবিধা হইল ললিতাকে লইয়াই। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, আমাকে কোথাও 'অরক্ষিত' অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া ওর রাত্রিতে মোটেই ঘুম হইবে না! আমার নিজের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আপনারা কোনদিন প্রেমে পড়েন নাই তো? আপনাদের কেমন করিয়া বুঝাই বলুন?

কলিকাতা হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ছবির মতো একটি ক্ষুদ্র স্টেশন্। কাছাকাছি কোনও লোকালয়ের চিহ্ন নাই; একটা গাছপালাও না, অনেক দূরে প্রায় আকাশের গায়ে মেশা একটা সবুজের সারি শুধু চোখে পড়ে, কিন্তু সে প্রায় ক্রোশ দুই হইবে। এমনি একটা ফাঁকা বিরাট মাঠ, মাঠও বলা চলে না—বিল। বছরের বেশীর ভাগ হয়তো জলেই ডুবিয়া থাকে; নানা রকমের ও রঙের জল-ঘাস, আগাছা, কচুরি-পানা—এই সবে ভর্ত্তি।

রেল-গাড়ি হইতে নামিয়া ফের গরুর গাড়িতে চাপিয়া বসিলাম।

একটি মাত্র কাঁচা মাটির সড়ক, দূরের গাঁয়ের পানে ব্যাকুল বাহু মেলিয়া দিয়াছে। গাড়ির চাকা বসিয়া গিয়া দুই পাশে দুইটি অপ্রশস্ত খালের সৃষ্টি হইয়াছে, বৃষ্টি হইলে তাহা জলে পূর্ণ হইয়া উঠে।—তাহারি উপর দিয়া মন্থর গতিতে গাড়ি চলিতে থাকে।

বেলা-শেষের আলো তখন প্রেমাবিষ্ট তরুণার চাহনির মতো স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। বাতাস কার অঞ্চল প্রান্তের সুমন্দ আন্দোলনের আভাস আনে।···গাড়ি মন্থর-গতিতে পশ্চিমের মুখে চলিয়াছি—যেন অস্তাচলের দেশে।

সড়কের নীচে দুই পাশে কলমি আর হিঞ্চের বনে ডাহুকের দল নিশ্চিন্তমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে পরিষ্কার জলে শাদা জল-হাঁসেরা সারি বাঁধিয়া সাঁতার কাটিতেছে।···দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি, আর ভাবিতেছি— এমন খোলা মাঠ, কাচা মাটির নরম পথ, খরের ঘর ভাঙিয়া মানুষ সুরম্য প্রাসাদ গড়িয়া আকাশকে আড়াল করিয়াছে, রুক্ষ পাষাণের রাজপথ বাঁধিয়া মাটিকে

অস্বীকার করিয়াছে, দিনে দিনে হাতের কাজ যন্ত্র-দানবের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে হাত গুটাইয়া বসিতে চাহিয়াছে—কিন্তু সত্যি সে তাহাতে সুখী হইতে পারিয়াছে কি? আজ স্পষ্টই মনে হয়, মানুষ এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতির সহজ জীবন-যাত্রাকে মারিয়া ফেলিয়া বিজ্ঞতার পাপ করিতেছে, সৌন্দর্য্যকে হত্যা করিয়া জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে, একদিন তাহাকে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সেদিন ওই সুরম্য প্রাসাদ নিজের হাতে সে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে, পাষাণের তলা হইতে মাটি-মাকে মুক্তি দিবে, আকাশের প্রাচীরের তলায় সে আর কোনও প্রাচীর তুলিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে একেবারে মগ্ন-চৈতন্য হইয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ চাহিয়া দেখি—সে আর এক দৃশ্য! অন্ধকার তার ব্যাকুল ডানা মেলিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য নামিয়া আসিতেছে, যেন এক মুহূর্ত্তে তাহার উত্তপ্ত দেহের সকল ক্লান্তি মুছিয়া লইবে। নিবিড় কালো বনশ্রেণীর মাঝে একটি দু'টি করিয়া পল্লীর গৃহ-লক্ষ্মীদের সান্ধ্য প্রদীপের ক্ষীণ-রশ্মী ফুটিয়া উঠিতেছে, নিরালা আকাশের গুটি কয়েক তারার মতো।

সুরুচিদের বাড়ির কাছে যখন আসিয়া পড়িলাম, তখন খানিকটা রাত্রি হইয়া গেছে। আকাশে আধখানা চাঁদ উঠিয়াছে, তাহারি স্নিগ্ধ আলোয় জমিদার-বাড়ির দেউড়িটা একটা বিরাট দৈত্যের মতো দেখা যায়।

গাড়ি বিদায় করিয়া ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে প্রবেশ করিলাম এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেখানে একটা ছোটখাট কোলাহল পড়িয়া গেল। সুরুচি ছুটিয়া আসিয়া পায়ের উপর ঢিপ্ করিয়া একবার মাথাটা আছ্ড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলে, বারে, ছোড়্দা' যে, ইস্ কত বড়ো হয়ে গেছ তুমি! মাথায় এত লম্বা চুল রেখেছো কেন? বাব্বা, চশ্মাও নে'য়া হয়েছে দেখ্ছি—

বলিলাম, তোকেও তো মোটেই চেনা যায় না, বেজায় মোটা হয়েচিস্; কিন্তু তোর সঙ্গে আমি কথা কইব না রুচি, ভয়ানক আড়ি—

সুরুচি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে, তারপর বলে, ইস্, আড়ি তো বটেই, দু'বচ্ছর বাদে দেখা হো'ল কিনা—

কথা শেষ না হইতেই হাসি থামিয়া যায়, দুই চোখ ওর জলে ভরিয়া উঠে।

কাঁধের উপর সস্নেহে একখানা হাত রাখিয়া বলি, তুই ভারি শক্ত মেয়ে রুচি, তা' নইলে একটি বার আমাদের বাড়ি যাবার নাম করিস্ না! কাকিমা কত চোখের জল ফেলেন—

সুরুচি এবার আর চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারে পারে না, আমার হাতের উপরেই কয়েক ফোঁটা ঝরিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সাম্লাইয়া লইয়া বলে, তোমরা তো জানোনা ছোড়্দা', তোমাদের জন্যে আমি কত কেঁদেছি। কিন্তু কী কোর্বো, এখানেও এমন ভাবে জড়িয়ে গেলাম যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এ-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আর উপায় রইলো না।

সুরুচি অতঃপর যাহা বলিল, তাহা এই, ওর শ্বশুর প্রায় দুই বছর ধরিয়াই শয্যাগত; এ-বাড়িতে সুরুচি ছাড়া তাঁহার মরজি অনুসারে কেহ চলিতে পারে না। এই জন্য বাড়ির আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার বড় একটা কোনো সংশ্রব নাই। সুরুচিকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন এবং সুরুচি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এ-বাড়িতে তিনি আর একমুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না—একথাও তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই সুরুচির এ-বাড়িতে আট্কা পড়িয়া 'থাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তবে সেদিন নাকি শশুর তাহার চোখে জল দেখিয়া ফেলিয়াছেন এবং অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা যাইবার জন্য কিছুদিন হইতে সুরুচির একটু বেশিরকম 'মন কেমন' করিতেছে!

এর পরেই কাকিমা চিঠি পান এবং আমাকে এখানে পাঠান।

একটি পনেরো-ষোলো বছরের তরুণী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া, বোধহয় ঘরে প্রবেশ করিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল, সুরুচি দেখিতে পাইয়া সহাস্যে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল, ইস্ মেয়ের যে বড্ডই লজ্জা দেখ্ছি! ছোড়দা'কে বুঝি আমার বিয়ের সময় ছাখোনি—না ?

দেখিয়াছে কিনা তাহা পরখ করিবার জন্য মেয়েটি আমার মুখের পানে না চাহিয়া আরক্ত মুখে মাটির পানেই চাহিয়া থাকে। আমি কিন্তু এবার তাহার দিকে চাহিয়াই চিনিলাম, ও মমতা, সুরুচির ননদ। দুয়ারের কাছে থাকিতেই চেনা উচিৎ ছিল, তবে এই দুই বছরে তাহার চেহারা এত বদ্‌লাইয়া গিয়াছে যে, তখন চিনিতে না-পারায় আমার এমন কোনো বড় অপরাধ হয় নাই।

একটু রহস্য করিয়া বলিলাম, মুখ লাল ক'রে মাটির দিকে চেয়ে-থাকার লক্ষণ কিন্তু মোটেই ভালো নয়, তাছাড়া অতিথি এসে বাড়িতে পা দিতেই তার মন খারাপ ক'রে দে'য়াও অতিথিপরায়ণতার কাজ নয়।

মমতা আরো লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি এবার সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া সুরুচির পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া একটু হাসিল। সত্য বলিতে কি, অমন হাসি ললিতাও হাসিতে পারে নাই (সত্য কথা বলিলাম, কপালে কি আছে—কে জানে!)।

তারপর একে একে বাড়ির সকলের সঙ্গেই আলাপ হইল।

সুরুচির শশুর বলিলেন, এসেছ যখন, দিন কয়েক পাড়া-গাঁয়ের হালচাল দেখে যাও বাবাজী। তোমরা হলে কোল্‌কাতার মানুষ, পাড়া-গাঁ তোমাদের নতুন লাগ্‌বারই তো কথা। কিন্তু আসল কথা. বৌ-মাকে নিয়ে কিন্তু বেশিদিন রাখ্‌তে পাবে না, তা আগে থাকতেই বলে রাখ্‌ছি।

সুধীর—সুরুচির স্বামী, স্বভাবতই একটু লাজুক ও বিনয়ী—বলিল, দিন কয়েক এখানে থেকেই যান না। বিকেলের দিকে বেশ রাইড্ করা যাবে, আর পাখী শিকার কর্‌তে চান্‌তো তারো সুবিধে আছে—

সুরুচির এক ভ্রুকুটি খাইয়া কথার মাঝখানেই কথা বন্ধ করিয়া দেয়।

মমতা বলে, ইস্ হঠাৎ এসেই বোনকে নিয়ে দৌড় দে'য়া বৈকি! জামা-জুতো সব লুকিয়ে রাখ্‌বো—

জামা-জুতা লুকাইয়া রাখিলেই একজনের চলিয়া যাওটাকে বেশ নির্ব্বিবাদে বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে, ইহাই ওর ধারণা।

যাহা হউক, অগত্যা কয়েক দিন থাকিয়া যাওয়াই স্থির হইল। ললিতার এ ক'টা রাত্রি নিশ্চয়ই বিনিদ্র কাটিবে, বাড়ি ফিরিয়া তিনদিন ধরিয়া অনুরোধ করিয়াও কথা বলাইতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহ—তা বলিয়া কী আর করা যাইবে? এতখানি ঝক্কি কাঁধে লইয়াও এখানে থাকিবার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল শিকারের লোভটা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া।

দিনগুলি বেশ ভালোই কাটে। পল্লীমায়ের ছায়া-সুশীতল অঞ্চলের আড়ালে যে শান্তির নীড়খানি রহিয়াছে, তাহাতে বাঁধা পড়িয়া যায় না,এমন মানুষ কে আছে? কেবল পাখীর গান, ফুলের সৌরভ আর মলয়-হাওয়াই নয় শুধু, সেখানকার মানুষের মনও মনকে কম টানে না।

একটি মেয়ে মমতা, একেবারে টিপিক্যাল্ পল্লীর মেয়ে। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর কোনো খবর ও রাখে না, ইস্‌কুলে কলেজে কোনোদিন পড়ে নাই—বিদ্যার দৌড় বড় জোর

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা এবং গান পর্য্যন্ত। রেডিও, গ্রামোফোন্, উড়োজাহাজের গপ্‌প শুনিয়া শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে—তবু ওকে কত ভালো লাগে। ওর ওই আয়ত দুটি চোখের সরল চাহনি দেখিয়াই বুঝি, মনটা ওর বিচার-বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের চাপে পড়িয়া আজো অবিশ্বাসী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

নিজের মনে-মনেই ললিতার সঙ্গে ওর একটা তুলনা করিতে সুরু করিয়া দিই। কোনো দিক দিয়াই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য মিলে না। ললিতা যদি হয় পৃথিবীর এ-পিঠ, মমতা তাহার ও-পিঠ। কিন্তু তাই বলিয়া মমতাকে আমার ভাল লাগে না, একথা কেমন করিয়া আজ বলি? মমতা যেন ক্রিশ্চিনিয়া রসেটির একটি কবিতা, রসে-সৌন্দর্য্যে ভরপুর; প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু বেগ নাই। যেটুকু ওর মধ্যে আছে, সেটুকু লইয়াই ও থাকিতে চায়, তাহাতেই ওর পূর্ণতা। কিন্তু ললিতায় মাঝে দেখি উদ্দামতা, একটা বেগ; যাহা ওর আছে, তাহা যেন কিছুই নয়, যাহা নাই, তাহার জন্য ওর অস্বস্তির আর সীমা নাই।—পূর্ণতা বলিয়া একটা জিনিষ ললিতার মধ্যে নাই।

মমতার আকাশে তারা ফোটে, তাতে কত না বিস্ময়, কত না স্বপ্নসমারোহ। ললিতার আকাশেও তারা ফোটে তাতে আছে শুধু বিজ্ঞানের শুষ্ক তত্ত্ব! তার সঙ্গে মমতার পৃথিবীর কোনোই যোগ নাই।

মমতাকে যখন বলিলাম যে, এবার কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে তাঁহার "তপতী" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন ওর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সবিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি?—কোন্ রবীন্দ্রনাথ?

ওর উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি করিয়া বলিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ বলিলেই যাঁর কথা সবার আগে ওর মনে হয়, আমি সেই রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিতেছি, যিনি মমতার, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের।

মমতা আর কিছু বলিতে পারে না। শুধু দু'টি কাজল চোখের দৃষ্টি দূরের পানে পাঠাইয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। ধীরে ধীরে তাহার মুখের উপর বেদনার একটুখানি অস্পষ্ট ছায়া ঘনাইয়া আসে।

আমি বুঝি, কিসের সে বেদনা। যে-পাখী আজন্ম খাঁচায় আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারো মনে একদিন খোলা-আকাশের স্বপ্ন বাসা বাঁধে।

আজ এই ম্লান সন্ধ্যায় মমতার একখানি হাত ধরিয়া একটুখানি আদর করিতে ইচ্ছা করে। মমতা হয়তো তাহা সহিতে পারিবে না, কাঁদিয়াই ফেলিবে—কিন্তু জানিতে পারিলে ললিতা যে তাহা লইয়া কি কাণ্ডটা করিবে, তাহা ভাবিয়াই নিরস্ত হইলাম।

কলিকাতা ফিরিবার দিন ঘনাইয়া আসে।

সুরুচির মনে আর খুশী ধরে না, কত যুগ ধরিয়া যেন ও কলিকাতা ফিরে নাই। কতগুলি বড় বড় রাস্তা হইয়াছে, ঢাকুরিয়া লেকের হ্যাঙ্‌গিঙ্‌ ব্রীজটা লোকের ভারে একদিন ভাঙিয়া পড়িয়াছে কিনা, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বুড়া বটগাছটা আরো কতখানি জায়গা জুড়িয়াছে—এই সব ছেলেমানুষি প্রশ্নের জবাব দিতে এ ক'দিন ধরিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আছে।

মমতাকে দেখিলে বাস্তবিক মমতাই হয়। ও যেন একটি মূর্ত্তিমতী শোকের কবিতা। শরত-প্রভাতের একটি শিশির-সিক্ত শিউলির শাখা, একটুখানি নাড়া পড়িলেই এক রাশ অশ্রু ঝরাইয়া দিবে। তাই ওকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি।

ছাদের এক কোণে আলিসার উপর বুকের ভর্ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বেলা-শেষের রঙিন আকাশখানির মধ্যে ওর সমস্ত চেতনা যেন মগ্ন হইয়া গেছে। পাশে গিয়া দাঁড়াইতেই হঠাৎ চমকিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কাল তো এমন সময় কল্‌কাতার কাছাকাছি থাক্‌বেন, খুব আনন্দ হচ্চে বুঝি?

বলিলাম, আনন্দ একটুও হচ্ছে না। সেই ঘর্-ঘর্ গড় গড় শব্দ, লোকের সঙ্গে ঠোক্কর খাওয়া—এই সব তো?—তার চেয়ে এখানেই আমার বেশ ভালো লাগ্‌ছে।—

মমতা দু'টি চোখে মিনতি ভরিয়া বলে, বেশ তো,

থেকেই যান্ না আরো কিছুদিন—থাক্‌বেন ? কি বলুন ?

আপনি তা'লে খুশী হ'ন ?

মমতা অসঙ্কোচে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, খু—ব।

তারপর হঠাৎ বলিল, না, আপনি চলেই যান্। বৌদির মা তাকে দেখ্‌বার জন্য নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে আছেন—

তাড়াতাড়ি মমতা চলিয়া গেল।

পরদিন আমরাও তাড়াতাড়ি করিয়াই গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। মমতাকে কিন্তু সেদিন আর দেখা গেল না।

একটা খাবারের বাক্স চাকরকে দিয়া মমতা জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিয়াছিল, বাগনানের কাছাকাছি সুরুচি তাহা খুলিয়া, দিব্যি একখানা প্লেটে সে-সব সাজাইতে সুরু করিল। কিন্তু ওর মুখটা তখনো শ্রাবণের আকাশের মতো থম্‌থমে হইয়া আছে দেখিয়া বলিলাম, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো নাকি রে রুচি ? চলে-আসার সময় সুধীরের সঙ্গে দেখা হয়নি বলে' মন খারাপ হয়ে আছে বুঝি ?

সেকথায় কাণ না দিয়া খাবারের প্লেটটা আমার সাম্‌নে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিল, মমতাকে আজ এই প্রথম কাঁদ্‌তে দেখ্‌লুম। আজ যদি এসঙ্গে ওকেও আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পার্‌তুম, তা'হলে কি আনন্দই না হোত,—ওর মুখেও হাসি ফুট্‌তো। আমি সত্যি বল্‌ছি ছোড়দা, তুমি বিশ্বেস করো, মমতা তা'হলে স্বর্গ হাতে পেতো, আর তুমিও হয়তো—

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তুই থাম্ বাপু, বক্ বক্ আর ভালো লাগে না। বুড়ো বুড়ো কথা কইবি'খন বাড়ি গিয়ে—আমার ঘুম পাচ্ছে।

সুরুচির গায়ের র‍্যাপারখানা সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

আবার কলিকাতা আসিয়া পড়িলাম। ললিতার সঙ্গে কোনও রকমে কম্‌প্রমাইস্-ও হইল ; কিন্তু মাঝের এই দিন কয়টা আমার জীবনের সহজ যাত্রা-স্রোতের মাঝে যে পাক ধরাইয়া দিয়া গেল, তার সঙ্গে কবে মীমাংসা হইবে ? ললিতা প্রথমতঃ চোখা চোখা শর নিক্ষেপ করিল ; রাগ করিয়া, পল্লীগ্রামের আব্‌হাওয়ার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত চোখের জল ফেলিয়াও কোনও কূলকিনারা করিতে পারিল না। ওর প্রধান অভিযোগ, কলিকাতা হইতে যে-মানুষটি সুরুচিকে আনিতে গিয়াছিল, সে-মানুষটি নাকি আর ফিরিয়া আসে নাই।

তথাপি সতেরোই বৈশাখ আসিয়া পড়ে। ললিতা মুখে হাসি এবং চোখে এক পুকুর জল লইয়াই আমার বুকের আশ্রয়টিতে নির্ব্বিবাদে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া বলে, আজ যদি একটুখানি মুখভার করেছ কি আমি তোমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে মর্‌বো।

আদর করিয়া ওর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলি, মানুষকে মেরে হাসাতে চাও বুঝি ললিতা, তুমি তা-ও পারো—

ছোট্ট খুকীর মতো এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত মাথা দুলাইয়া ললিতা বলে, বেশ বেশ, পারিতো পারি। কিন্তু আজ্‌কের দিনে যদি আমাকে কাঁদাও, তাহ'লে অনর্থ কর্‌বো বলে দিচ্ছি—

অনেকক্ষণ দৌরাত্ম্য করিয়া ললিতা আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুক্ল-চতুর্দ্দশীর অম্লান জ্যোৎস্নালোক ওর মুখে, বুকে, সমস্ত তনু-দেহখানির উপর অবিশ্রান্ত যুঁইবৃষ্টি করিতেছে।

আজ রাতে মনে হয়, ললিতা যদি মমতা হইত, তবে বুঝি এ-রাতে সে-ও এমনি করিয়া আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিত। ললিতা ঘুমাইয়াছে—ঘুমাইয়া ভালো করিয়াছে—কিন্তু মমতার চোখে আজ রাতে কিছুতেই ঘুম আসিত না। নিবিড় কালো দুটি অতন্দ্র চোখের দৃষ্টি আমার মুখের পানে অপলক হইয়া থাকিত। কিম্বা আজ রাতে হয়তো মমতার কোলে মাথা রাখিয়া আমারই ঘুমাইবার পালা ছিল।—কে জানে ?

ললিতা যদি মমতা হইত !

ঝপ্‌ঝপের দহ

বন্দেআলী মিঞা

চক্‌-নূরপুর পার হোয়ে গেলে হালটের কিছু দূরে
ঝপ্‌ঝপে দহ ঘুমায়ে পড়েচে আধখানি গাঁও জুড়ে—
পার দিয়ে তার আউস আমনে মিতার মতন ভাব,
তিসি, যব, ধানে হানে করতালি মনে হয় দেবে ঝাঁপ ;
দুর্ব্বা ছিঁড়িয়া চাপ্‌ চাপ্‌ মাটি ভেঙে ভেঙে রোজ পড়ে
ওরি ফাটলেতে শালিখ পাখীরা কেঁচো খুঁজে খুঁজে ধরে।
এপারে চাহিয়া ওপারের ওই মাউদপুরের চর
পূবের বাতাসে উড়াইয়া বালু কাঁদে যেন দিন ভর ;
কৃষাণের কুঁড়ে পাতার ছাউনী মেঘ সামিয়ানা তলে
কলা পাতাগুলা ছেঁড়া-পাতা নাড়ি কত কথা ওরে বলে।
চলা আল-পথ বাঁকিয়া চুড়িয়া নামিয়াছে দহে যেথা
বুড়ো বট সেথা কাঁদিছে বাতাসে ভীরু দুর্ব্বলচেতা—
উহার শাখায় কোঁড়াল পাখীরা বৈশাখে বাঁধে বাসা,
শকুণ শকুণী করিছে ঝগড়া নেই যেন ভালোবাসা।
কাক তার ছোট শাবকের লাগি খাবার আনিছে ঠোঁটে
কারে আগে দেবে— মার সাড়া পেয়ে সকলেই জেগে ওঠে।
ও-রি তলে বসি রাখাল বালক বঁড়শী ফেলিয়া দ'য়
ফাত্‌নার পানে চাহিয়া চাহিয়া সারাদিন বসে রয়।
বিষ্টির দিনে তালের ছাতায় রুধিতে পারে না জল
মাথাল চুপ্‌সে ভেজে তার দেহ—দেয়া পড়ে অবিরল।
কেঁচো টোপ খেতে এসেচে যে পুঁঠি ট্যাংরা, পাবদা, টাকী,
রাখাল ছেলের কৌশলী টানে পারেনিক' দিতে ফাঁকি—
কৈ, মাগুরেরা ঝট্‌ পট্‌ করি নিস্ফল রোষে জ্বলে,
সব পাশাপাশি শুয়ে আছে তার মলিন গামছা তলে।

দহের এপারে বাবলার গাছ—শাখা পাতা যেন নাই,
ন্যাকড়া ঝুলিছে সব ডালে তার এতটুকু নাই ঠাঁই।
জুতো পাট্‌কেল কঞ্চির আগা বেঁধেচে কে নিরিবিলি
'তেনা ছেঁড়া গাছ' নাম দেছে কবে গাঁয়ের লোকেরা মিলি।

ইতিহাসে এর যায়নিক' জানা চোখে দেখি সুধু রোজ,
ভিন্‌ গাঁ হইতে লোকেরা আসিয়া সুধায় ইহার খোঁজ ;
কোন্‌ অভাগীর মরা ছেলে হয়—কাহার' হয়না মোটে,
কাহারো সোয়ামী গেছে পরবাসে—পেটে নাহি দানা জোটে ;
দোয়াল গাভীটা কোথা গেছে কার—বাছুর খায়না ঘাস,
কার জালি গেদা ছাড়িয়াছে দুধ দুদিন সে উপবাস,
শত রকমের নালিশ লইয়া এই গাছটির তলে
বেটাছেলে কত, মেয়েছেলে কত রোজ আসে দলে দলে ;
যাদের মানস হয়েচে হাঁসিল হাজত আনিছে তারা,
ভাঁড় ভাঁড় দুধ—চিনি ধামা ভরা—পায়সে ভরিয়া হাঁড়া ;—
গাছের গোড়ায় দুধ সিঁন্দুরের হয়ে গেছে সরোবর—
খিজুরী বাতাসা সিন্নি সে চলে ভোর হতে রাত-ভর।

নীহার-চুবানো ঘাসের উপরে কাস্তে কোদাল নিয়া—
পান্তা খাইয়া রাখাল যখন চলে ও হালট দিয়া,
আওলা গোহাল মুক্ত করিয়া দহের ওই ও-পাশে
চাষার মেয়েরা অতি বেহনেই জল ভরিবারে আসে।
বালু লয়ে লয়ে কেহ দাঁত ঘসে, কেহ বা বাসন মাজে,
ওই মাটি দিয়ে মাথা ঘসে কেহ লাগে বেসমের কাজে ;
চাষার মেয়েরা দুষ্টু বেজায় মাছ চুরি করা ভাবি
চারিদিকে চাহি চুপে চুপে তারা মাজা জলে যায় নাবি।
বর্ষার দিনে গাঁয়ের ছেলেরা বানা দিয়ে কূলে কূলে
পেতেচে যে চারো দোহার খাদুন খোঁড়ে তাই তুলে তুলে।
মউলি, চিংড়ী, খর্‌সুলা মাছ ডাঙার অতিথি হয়ে
তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে দিয়ে যেতে চায় প্রাণ ভয়ে,
তাড়াতাড়ি তুলি কোঁচড়ের খুঁটে গেরো দিয়ে বাড়ী যায়
পড়ে থাকা গুলো তখন চিলেরা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়।

———

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর কবিতা

এ-কথা সত্য যে, নব্য বঙ্গ-সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর সগোত্র নেই। মাসিক পত্রে যখন তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি প্রথম প্রেমের কবি। তখনকার কথা তিনি নিজেই বলেছেন :—

"মনে পড়ে কৈশোর আকাশে
শুধু আলো শুধু নির্ম্মলতা
বেদনার বিষ-বাষ্প সেথা নাহি ভাসে।
অনেকেরে নাহি জানি সেথা শুধু একের জনতা।
পৃথিবীর পাইনি ঠিকানা
মানুষ দরিদ্র আছে এ খবর ছিল নাকো জানা।"

("মানুষ", ৭৬ পৃষ্ঠা)

তখন শিবরাম আমাদের সকলের মতো চোদ্দ অক্ষরের সঙ্গে চোদ্দ অক্ষর কিম্বা দশ অক্ষরের সঙ্গে দশ অক্ষর মিলিয়ে পদ্য লিখ্‌তেন। তারপরে একদিন দেখা গেল, তিনি চোদ্দ'র সঙ্গে দশ কিম্বা আঠারোর সঙ্গে আট মিলিয়ে "বলাকা"র ধরণে কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছেন। "মানুষ" ও "চুম্বন" নামে শিবরামের যে দু'খানি কাব্য-সংগ্রহ বেরিয়েছে তাদের কেবলমাত্র একটি কবিতা সেকালের শিবরামের, বাকীগুলি একালের শিবরামের। তাঁর একেলে রচনার নমুনা উপরে দিয়েছি, সেকেলের নমুনা দিই।

"আজি মর্ত্ত্যের বাঁকাপথে প্রেম
ভয়ে ভয়ে করে অভিসার
সে চরণ-ধ্বনি শুধু ওঠে রণি'
ছন্দে ছন্দে কবিতার!
দিকে দিকে শির তুলেছে অধীর
পাষাণ বধির কারাগার
তারি চাপে আজি পতিত মথিত
ব্যথিত করিছে হাহাকার!
আজিকে দৈত্য মেলেছে লক্ষ বাহুপাশ!
নৃত্য-ছন্দ রস-আনন্দ সৌন্দর্য্যেরই রাহুগ্রাস!"

("চুম্বন", ১৫ পৃষ্ঠা)

বোঝা যাচ্ছে, আমরা সবাই সচরাচর যে-ছাঁদে লিখে থাকি, শিবরাম সে-ছাঁদের লেখাতে ওস্তাদই ছিলেন ; তবে কেন তিনি "বলাকা"র ছাঁদে লিখে, সেই লেখাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা বলে পাঠক সাধারণের হাতে ধরে দিলেন? কারণ বল্‌বার আগে বলে নিই যে "বলাকা"র ছাঁদের লেখা এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো হাতে ওৎরায় না, এমন কি সব সময় রবীন্দ্রনাথের হাতেও না। দ্বিতীয়তঃ আমার একটা কুসংস্কার আছে যে ওরকম ভাঙা ছন্দের রচনা কবিতাই নয়। বন্ধনই হলো কবিতার সৌষ্ঠব, বণিতার যেমন কঙ্কণ। কবিতাকে বিধবা কর্‌লে তার ঝঙ্কার চলে যায়।

তবু শিবরামকে অসমছন্দের কবিতা লিখ্‌তেই হলো। তার কারণ, শিবরামের বেদনা এত প্রবল যে ওকে ছন্দের বন্ধন স্বীকার করানো যায় না, ও পাখীকে খাঁচায় পুর্‌বার আগে ওর প্রাণ চলে যায়। দ্বিতীয়, শিবরামের জীবনে অবিরাম তুষানল জ্বলছে—কায়দা জেনে কাব্য লেখ্‌বার ছেলেখেলা তাঁর সাজে না।

"আমার স্বাচ্ছন্দ্য মোরে হানিছে বিকার
এই আলো এ বাতাস
যেন পরিহাস

আমার সম্মান মোরে করে অপমান। * * *
ভূমাতেও নাহি সুখ, অমৃতেও নাহি অধিকার
—কে সহিবে আত্মার ধিক্কার।
বড়ো মার আনন্দের মারে। * * *
সুখ নাই পূর্ণতায়, তিক্ত প্রেয়সীর ওষ্ঠাধর
সভ্যতায় সুখ নাই. শত কোটী নর যার পর—
এ ভুবন এত সুখহীন—বেদনাও হেথায় বিলাস।”
(“মানুষ”, ৪৬।৪৭ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় শিবরামের কবিতা চোখের জলে লেখা কবিতা এবং এ চোখের জলের বিশেষত্ব, এর উৎসমূলে কোনো মানসী-প্রেয়সী নেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ এই কবিটিকে কবিতায় কাঁদান নি। শিবরামের বেদনা মানুষের বেদনা দেখে বেদনা, মায়ের কান্না দেখে শিশুর কান্নার মতো। মা তো তবু নিকট, শিবরামের বেদনা দূরের জন্যে, পরের জন্যে।

“অন্তর উন্মথি’ মোর জাগে হাহাকার
একি তবে যৌবন আমার?
এই যে জনতা—
এ মোর আত্মীয় নহে, নাহি বোঝে মোর অপূর্ণতা!
এরি লাগি করি আত্মদান?
সে নহে কি সুন্দরের—মোর দেবতার অসম্মান?
যারে ভালোবাসি তারে চিরদিন রাখিব কি দূরে?
যারা নাহি ভালোবাসে বন্দী রবো তাহাদেরি পুরে?
* * * * *
সহসা বিদ্যুৎ কশা বাজে মোর চিতে—
বিশ্ব যদি চলি যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রবো আপনার আনন্দ সাধিতে?
* * * * *
এই দ্বন্দ্ব এ মোর যৌবন!
এ শুধু এনেছে ব্যথা বিষজ্বালা বহি’
আনিয়াছে দুরন্ত কামনা
তারি সাথে বিশ্বের ভাবনা
দু’দিকে এ করে আকর্ষণ
এরে আমি কেমনে যে সহি!”
(“মানুষ”, ৭৫ পৃষ্ঠা)

এই দ্বন্দ্ব প্রথম শিবরামের সঙ্গে দ্বিতীয় শিবরামের এবং মোটের উপর “চুম্বনের” সঙ্গে “মানুষের।” “চুম্বনের” কবি মোটের উপর ভোগের কবি, সৌন্দর্য্যের কবি, সব কবি যেমন হয়ে থাকে। “মানুষে”র কবি কিন্তু প্রোফেট্। এবং বড় অক্ষম প্রোফেট্। মানুষকে তিনি তেজ দিতে পারছেন না উৎসাহ দিতে পারছেন না, উচ্চকণ্ঠে বল্‌তে পারছেন না যে “ক্লৈব্যং মাস্ম গম,” যে-মানুষ অজর অমর সর্ব্বশক্তিমান, তার মুখপাত্র শিবরাম হলেও হতে পারতেন কিন্তু হন্‌ নি। মাকে কাঁদতে দেখে যে-শিশু কেঁদে আকুল, মায়ের মুখে হাসি ফোটানো তাকে দিয়ে হবার নয়। “সবার সমান” না হলে যার নিজের স্বস্তি নেই, সবাইকে নিজের সমান করে তুল্‌বার—সবাইকে উপরে টেনে তুল্‌বার—জোর তাঁর কোথায়? তাই “মানুষে”র কবিতাগুলি আমার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মতো লেগেছে। তবু এ কান্না আন্তরিক, এই রক্ষা। পেশাদার কান্নাজীবির অভাব তো নেই, মানুষের জন্যে কাঁদাটা এ যুগের একটা ফ্যাসান্। তবু এ কথা সত্য যে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর গোত্র আলাদা।

“মানুষে”র চেয়ে “চুম্বন” টিক্‌বে। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে শিবরাম অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম মেনে রেগুলার ছন্দের কবিতা লিখলেন না, লিখলেন কি না “বলাকা”র অসম ছন্দে। সাত আট বছর আগে “ভারতী” প্রভৃতিতে যে কবি-ক্ষমতার সূচনা তিনি দিয়েছিলেন, সে ক্ষমতার পরিণতি কি এই? এক্‌শো রকম ছন্দে এক্‌শো রকম অনুভূতি কি এতে আছে? অসম ছন্দের পরম দোষ, ও ছন্দ রেশ রেখে যায় না, শেষ হয়ে যাবা মাত্রেই শেষ হয়ে যায় এবং অসম ছন্দের প্রলোভন এমন যে ও-ছন্দের কবিতা ভারবন্ত হয় না, কম্প্যাক্ট বিবরণ-মূলক “পদাতিকা” ধরণের কবিতা ছাড়া অন্য কোন কবিতাকে ও-ছন্দে মানায় না। এবং কাগজের উপরে ও-ছন্দের কবিতাকে দেখতে চোখে লাগে। ওর রেখা-বিন্যাস কিম্ভূত।

“চুম্বনে”র একটি কবিতা শিবরামকে অমরত্ব দেবে, স্থলে স্থলে শ্রুতিকটু হলেও। আমি তার সব চেয়ে সরল অংশটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর কবিতা

এ-কথা সত্য যে, নব্য বঙ্গ-সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর সগোত্র নেই। মাসিক পত্রে যখন তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি প্রথম প্রেমের কবি। তখনকার কথা তিনি নিজেই বলেছেন :—

"মনে পড়ে কৈশোর আকাশে
শুধু আলো শুধু নির্ম্মলতা
বেদনার বিষ-বাষ্প সেথা নাহি ভাসে।
অনেকেরে নাহি জানি সেথা শুধু একের জনতা।
পৃথিবীর পাইনি ঠিকানা
মানুষ দরিদ্র আছে এ খবর ছিল নাকো জানা।"

("মানুষ", ১৬ পৃষ্ঠা)

তখন শিবরাম আমাদের সকলের মতো চোদ্দ অক্ষরের সঙ্গে চোদ্দ অক্ষর কিম্বা দশ অক্ষরের সঙ্গে দশ অক্ষর মিলিয়ে পদ্য লিখ্‌তেন। তারপরে একদিন দেখা গেল, তিনি চোদ্দ'র সঙ্গে দশ কিম্বা আঠারোর সঙ্গে আট মিলিয়ে "বলাকা"র ধরণে কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছেন। "মানুষ" ও "চুম্বন" নামে শিবরামের যে দু'খানি কাব্য-সংগ্রহ বেরিয়েছে তাদের কেবলমাত্র একটি কবিতা সেকালের শিবরামের, বাকীগুলি একালের শিবরামের। তাঁর একেলে রচনার নমুনা উপরে দিয়েছি, সেকেলের নমুনা দিই।

"আজি মর্ত্ত্যের বাঁকাপথে প্রেম
ভয়ে ভয়ে করে অভিসার
সে চরণ-ধ্বনি শুধু ওঠে রণি'
ছন্দে ছন্দে কবিতার!
দিকে দিকে শির তুলেছে অধীর
পাষাণ বধির কারাগার
তারি চাপে আজি পতিত মথিত
ব্যথিত করিছে হাহাকার!
আজিকে দৈত্য মেলেছে লক্ষ বাহুপাশ!
নৃত্য-ছন্দ রস-আনন্দ সৌন্দর্য্যেরই রাহুগ্রাস!"

("চুম্বন", ১৫ পৃষ্ঠা)

বোঝা যাচ্ছে, আমরা সবাই সচরাচর যে-ছাঁদে লিখে থাকি, শিবরাম সে-ছাঁদের লেখাতে ওস্তাদই ছিলেন; তবে কেন তিনি "বলাকা"র ছাঁদে লিখে, সেই লেখাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা বলে পাঠক সাধারণের হাতে ধরে দিলেন? কারণ বল্‌বার আগে বলে নিই যে "বলাকা"র ছাঁদের লেখা এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো হাতে ওৎরায় না, এমন কি সব সময় রবীন্দ্রনাথের হাতেও না। দ্বিতীয়তঃ আমার একটা কুসংস্কার আছে যে ওরকম ভাঙা ছন্দের রচনা কবিতাই নয়। বন্ধনই হলো কবিতার সৌষ্ঠব, বণিতার যেমন কঙ্কণ। কবিতাকে বিধবা কর্‌লে তার ঝঙ্কার চলে যায়।

তবু শিবরামকে অসমছন্দের কবিতা লিখ্‌তেই হলো। তার কারণ, শিবরামের বেদনা এত প্রবল যে ওকে ছন্দের বন্ধন স্বীকার করানো যায় না, ও পাখীকে খাঁচায় পূর্‌বার আগে ওর প্রাণ চলে যায়। দ্বিতীয়, শিবরামের জীবনে অবিরাম তুষানল জ্বল্‌ছে—কায়দা জেনে কাব্য লেখ্‌বার ছেলেখেলা তাঁর সাজে না।

"আমার স্বাচ্ছন্দ্য মোরে হানিছে বিকার
এই আলো এ বাতাস
যেন পরিহাস

আমার সম্মান মোরে করে অপমান। * * *
ভূমাতেও নাহি সুখ, অমৃতেও নাহি অধিকার
—কে সহিবে আত্মার ধিক্কার!
বড়ো মার আনন্দের মারে। * * *
সুখ নাই পূর্ণতায়, তিক্ত প্রেয়সীর ওষ্ঠাধর
সভ্যতায় সুখ নাই, শত কোটী নর যার পর—
এ ভুবন এত সুখহীন—বেদনাও হেথায় বিলাস!"
("মানুষ", ৪৬।৪৭ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় শিবরামের কবিতা চোখের জলে লেখা কবিতা এবং এ চোখের জলের বিশেষত্ব, এর উৎসমূলে কোনো মানসী-প্রেয়সী নেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ এই কবিটিকে কবিতায় কাঁদান নি। শিবরামের বেদনা মানুষের বেদনা দেখে বেদনা, মায়ের কান্না দেখে শিশুর কান্নার মতো। মা তো তবু নিকট, শিবরামের বেদনা দূরের জন্যে, পরের জন্যে।

"অন্তর উন্মথি' মোর জাগে হাহাকার
এরি তরে যৌবন আমার?
এই যে জনতা—
এ মোর আত্মীয় নহে, নাহি বোঝে মোর অপূর্ণতা!
এরি লাগি করি আত্মদান?
সে নহে কি সুন্দরের—মোর দেবতার অসম্মান?
যারে ভালোবাসি তারে চিরদিন রাখিব কি দূরে?
যারা নাহি ভালোবাসে বন্দী রবো তাহাদেরি পুরে?
* * * * *
সহসা বিদ্যুৎ কশা বাজে মোর চিতে—
বিশ্ব যদি চলি যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রবো আপনার আনন্দ সাধিতে?
* * * * *
এই দ্বন্দ্ব এ মোর যৌবন!
এ শুধু এনেছে ব্যথা বিষজ্বালা বহি'
আনিয়াছে দুরন্ত কামনা
তারি সাথে বিশ্বের ভাবনা
দু'দিকে এ করে আকর্ষণ
এরে আমি কেমনে যে সহি!"
("মানুষ", ৭৫ পৃষ্ঠা)

এই দ্বন্দ্ব প্রথম শিবরামের সঙ্গে দ্বিতীয় শিবরামের এবং মোটের উপর "চুম্বনের" সঙ্গে "মানুষের।" "চুম্বনের" কবি মোটের উপর ভোগের কবি, সৌন্দর্য্যের কবি, সব কবি যেমন হয়ে থাকে। "মানুষে"র কবি কিন্তু প্রোফেট্। এবং বড় অক্ষম প্রোফেট্। মানুষকে তিনি তেজ দিতে পারছেন না, উৎসাহ দিতে পারছেন না, উচ্চকণ্ঠে বলতে পারছেন না যে "ক্লৈব্যং মাস্ম গম," যে-মানুষ অজর অমর সর্ব্বশক্তিমান, তার মুখপত্র শিবরাম হলেও হতে পারতেন কিন্তু হন্‌নি। মাকে কাঁদতে দেখে যে-শিশু কেঁদে আকুল, মায়ের মুখে হাসি ফোটানো তাকে দিয়ে হবার নয়। "সবার সমান" না হয়ে যার নিজের স্বস্তি নেই, সবাইকে নিজের সমান করে তুল্‌বার—সবাইকে উপরে টেনে তুল্‌বার—জোর তাঁর কোথায়? তাই "মানুষে"র কবিতাগুলি আমার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনির মতো লেগেছে। তবু এ কাঁদুনি আন্তরিক, এই রক্ষা। পেশাদার কাঁদুনীজীবির অভাব তো নেই, মানুষের জন্যে কাঁদাটা এ যুগের একটা ফ্যাসান্। তবু এ কথা সত্য যে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর গোত্র আলাদা।

"মানুষে"র চেয়ে "চুম্বন" টিক্‌বে! আমার আক্ষেপ কেবল এই যে শিবরাম অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম মেনে রেগুলার ছন্দের কবিতা লিখলেন না, লিখলেন কি না "বলাকা"র অসম ছন্দে। সাত আট বছর আগে "ভারতী" প্রভৃতিতে যে কবি-ক্ষমতার সূচনা তিনি দিয়েছিলেন, সে ক্ষমতার পরিণতি কি এই? এক্‌শো রকম ছন্দে এক্‌শো রকম অনুভূতি কি এতে আছে? অসম ছন্দের পরম দোষ, ও ছন্দ রেশ রেখে যায় না, শেষ হয়ে যাবা মাত্রেই শেষ হয়ে যায় এবং অসম ছন্দের প্রলোভন এমন যে ও-ছন্দের কবিতা ভাবঘন হয় না, কম্প্যাক্ট বিবরণ-মূলক "পলাতকা" ধরণের কবিতা ছাড়া অন্য কোন কবিতাকে ও-ছন্দে মানায় না। এবং কাগজের উপরে ও-ছন্দের কবিতাকে দেখতে চোখে লাগে। ওর রেখা-বিন্যাস কিম্ভূত।

"চুম্বনে"র একটি কবিতা শিবরামকে অমরত্ব দেবে, স্থলে স্থলে শ্রুতিকটু হলেও। আমি তার সব চেয়ে সরস অংশটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

"গাহি জয় জননী রতির !
এ ভুবনে প্রথমা গতির
গাহি জয়—
যে গতির মাঝে ছিল জীবনের শত লক্ষ গতি
নিত্য নব আগতির
অনন্ত বিস্ময় !
স্বর্গ হতে আসিল যে রসাতলে নেমে
সকলের পাপে আর সকলের প্রেমে * * *
গাহি জয় সে বিজয়িনীর ! * * *
যে বিপুল যে বিচিত্র যে বিনিদ্র কাম
গাহি জয়—তারই জয় ।"

("চুম্বন" ৪৪।৪৫ পৃষ্ঠা)

শিবরামের কবিতার হাত বড় মিষ্টি। অসম ছন্দও সকলের হাতে এত মিষ্টি হয় না। মানবের প্রেম ছেড়ে যদি কোনো দিন তিনি মানবীর প্রেমে পড়েন, তবে তার সেই দিনকার বহু-ছন্দা কবিতা তাঁর প্রতিভাকে সুপরিণতি দেবে।

শ্রীলীলাময় রায়

টমাস্ ম্যান্

এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জার্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টমাস্ ম্যান্। এর আগে আমাদের দেশে টমাস্ ম্যান্-এর নাম খুব অল্প সংখ্যক সাহিত্যরসিকই জান্‌তেন; এমন কি বিলেতেও তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন খুব অল্প দিন—মার্ত্তিন্ সেকার্ কর্ত্তৃক তাঁর কয়েকখানা বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। সে বোধ হয় পাঁচ বছরেরও কম দিনের কথা। এই অল্প সময়ের ভেতরেই সমগ্র য়ুরোপে তাঁর রচনার প্রভূত আদর হয়। এবার নোবেল-সমিতি তাঁর মস্তকে জগতের অদ্বিতীয় সম্মানের বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বে আজ তাঁর প্রতিভার অমল জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে।

লারেম্‌বার্গ নগরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন টমাস্ ম্যান্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্থানীয় এক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, টমাস্ ম্যান্-এর *Buddenbrooks*-এ তার বর্ণনা আছে। যোল বছর বয়সের সময় টমাসের পিতৃবিয়োগ হয়। মা মারা যান ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ছেলেকে তিনি গৌরবের সুমেরু শিখরে অধিষ্ঠিত দেখে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু সমগ্র জার্ম্মাণীতে সেই সময়েই তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়েছিল।

টমাস্ ম্যান্-এর সাহিত্যিক জীবনের সুরু হয়েছিল বল্‌তে গেলে ম্যুনিকের এক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির আপিস-গৃহে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে অবৈতনিক কেরাণী হয়ে প্রবেশ করেন। যে দেশের প্রসিদ্ধ নাট্যকার হান্‌স্ স্যাক্‌স্, ভাস্কর পেটার ভিচার্, চারুশিল্পী আল্‌ব্রেচ্‌ট্ ডুরার্ ছিলেন চর্ম্মকার, সেই দেশেই টমাস্ ম্যান্-এর জন্ম। সুতরাং সে-দেশের ভবিষ্যৎ অদ্বিতীয় সাহিত্যরথীকে কোনো আপিস-গৃহে অবৈতনিক কেরাণীরূপে দেখ্‌লে আমাদের আশ্চর্য্য হ'বার কোনোই কারণ নেই।

আপিসের দলিলের নীচে খাতা রেখে টমাস্ লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প লিখতে সুরু করেন। এই রকম একটি গল্প পরের বছর *"Gesellschaft"* কাগজে ছাপা হয়। গল্পটির নাম *Fallen*। এ-গল্প প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই তরুণ সাহিত্য-ব্রতীর প্রতি কতিপয় শ্রেষ্ঠ সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং তিনি কিছু সুনাম অর্জ্জন করেন। সাহিত্য-সেবায় সর্ব্বপ্রথম এই উৎসাহ পেয়ে টমাস্ অবিলম্বে ইন্‌সিওরেন্‌স্ আপিসের কেরাণীগিরির কাজে ইস্তাফা দেন এবং সংবাদপত্র পরিচালন-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ম্যুনিক্ য়ুনিভার্সিটিতে যোগদান করেন।

ম্যুনিক্ থেকে অতঃপর তিনি তাঁর একমাত্র আর্টিষ্ট-ভ্রাতা হেইন্‌রিক্ ম্যান্-এর সঙ্গে রোমে গমন করেন। ছুটি ভাই Via Forre Argentina-তে ঘর নিয়ে বাস করতে থাকেন। এসময় টমাস্ বহু বিদেশী গ্রন্থকারের গ্রন্থরাজি পাঠ করেন। টলষ্টয়ের রচনা তাঁর খুব ভালো লাগে। টলষ্টয়ের কয়েকটি গল্প ইনি জর্ম্মনে ভাষান্তরিত করেন। আর্থার হোল্‌টিস্‌চার্ নামক কোনো একজন অখ্যাতনামা সাহিত্যিক একবার টমাসের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি যান। টমাস্ তখন টলষ্টয়ের প্রকাণ্ড চিত্রের

নীচে একটা পিয়ানোর কাছে বসে ***Buddenbrooks***-এর শেষ পাতাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন।

ইটালীতে থাকার সময়েও তিনি প্রচুর গল্প ও একখানা প্রকাণ্ড উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ***Buddenbrooks***-এর কিয়দংশ ইটালিতেই রচিত হয়েছিল।

কয়েক বছর পরেই টমাস্ ম্যুনিকে ফিরে আসেন এবং অসমাপ্ত গ্রন্থ ***Buddenbrooks*** শেষ করেন। এর আগেই তাঁর গল্প-গ্রন্থের একখণ্ড ***Little Mr. Friede Mann*** নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পে ভাষার যে সহজ সুন্দর ও সতেজ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, আধুনিক জর্ম্মন-সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই তার প্রবর্ত্তন করেন।

টমাস্ ম্যান্-এর রচনা শুধু ছবি এঁকেই শেষ নয়,—তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্য আলোক-চিত্রে পর্য্যবসিত হয় নি। তাঁর সকল রচনাই উদ্দেশ্যমূলক। কথাকে অযথা ফেনিয়ে বলার প্রয়াস তাঁর ভেতর মোটেই নেই। সুমধুর ও প্রাণস্পর্শী শব্দ-যোজনায় টমাস্ সিদ্ধহস্ত।

ইটালি থেকে ফিরে এসে টমাস্ নানা কাগজে ছোট গল্প লিখ্‌তে সুরু করেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং সংখ্যার প্রাচুর্য্যে সেগুলো কোনো অংশেই কম নয়। প্রত্যেকটি গল্পেই টমাসের লিখন-ভঙ্গির বিশেষত্ব ও মননশীল চিত্তের পরিচয় থাক্‌তো।

প্রধানতঃ *Buddenbrooks* প্রকাশিত হওয়ার পরেই টমাস্ ম্যান্-এর খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডী পার হয়ে বিলেত ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। জার্ম্মাণীতে তো এ-বই একরকম পারিবারিক-গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

Buddenbrooks-এর ঘটনাবস্তু সাধারণতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের একটি জর্ম্মণ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে (the House of Buddenbrooks) কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। তারি সঙ্গে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—জার্ম্মাণীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক আবহাওয়ার পরিচয়; এবং এই পরিচয় ফুটিয়ে তুল্‌তে গিয়ে তিনি রঙ্ ও তুলির যে কলাকুশলতা প্রদর্শন করেছেন, সেইখেনেই তাঁর যথার্থ শক্তির বিকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই। *Buddenbrooks*-এর সঙ্গে গল্‌সোয়ার্দ্দির ***Forsyte Saga***-র খানিকটা মূলগত ঐক্য দেখা যায়। এজন্য অনেকে ***Buddenbrooks***-কে জার্ম্মাণীর ***Forsyte Saga*** বলে থাকেন, বিশেষতঃ বিলেত ও আমেরিকার পাঠক-সম্প্রদায়।

Buddenbrooks প্রকাশিত হওয়ার পরে ***Tristan*** নামে টমাসের আর একখণ্ড গল্প-গ্রন্থ বেরোয়। এতে *Tonio Kroger* শীর্ষক অধুনা বহু-আলোচিত গল্পটি আছে। ছ' বছর পরে *Royal Highness* নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই বইখানা ঠিক তাঁর বিয়ের অব্যবহিত পরেই রচিত হয়। ম্যুনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের মেয়ের (Katja Pringshein) সঙ্গে ত্রিশ বছর বয়সে টমাসের বিয়ে হয়।

অতঃপর টিউবার্‌কোলোসিস্ স্যানিট্যরিয়াম্ নিয়ে লেখা ছ'খণ্ডে সমাপ্ত প্রকাণ্ড উপন্যাস ***The Magic Mountain*** প্রকাশিত হয়। Mr. Lowe-Porter অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে, চমৎকার ইংরাজিতে এ-বইয়ের অনুবাদ করেন। ***The Magic Mountain***-এ দেখতে পাই, টমাসের দৃষ্টি আরো প্রসারতা লাভ করেছে,—***Buddenbrooks***-এর বহির্ম্মুখী-দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী হ'য়ে নিবিড়তার সন্ধান পেয়েছে। যখন চিন্তার সঙ্গে আবেগের পূর্ণমিলন সংসাধিত হয়, বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, তখনি শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ আমরা দেখতে পাই। ***The Magic Mountain***-এ টমাসের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ না-হলেও তার খুব কাছাকাছি।

টমাস্ ম্যান্-এর গল্পের মধ্যে *Death in Venice*-কেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এ-গল্পের প্রধান নায়ক Gustav Aschenbach-এর চরিত্র তিনি গ্রহণ করেছেন, সুপ্রসিদ্ধ সুরসাধক Gustav Mahler-এর জীবনী থেকে। সমালোচক বলেন, "Here the style of Thomas Mann reached its height of perfection. It is lucid, and easy-flowing, yet cold and clear and flexible as Toledo steel." তাঁর অধুনা-প্রকাশিত *Early sorrow* উপন্যাস নিয়ে বিলেতে সম্প্রতি বেশ হৈ চৈ চল্‌চে। উক্ত গ্রন্থের কল্পনাতে নাকি অনেকখানি

অদ্ভুতত্বের আশ্রয় নে'য়া হয়েছে। এক অধ্যাপক দেশের যত সব কুৎসিৎ লোকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এক নাচের মজলিস্ বসিয়েছিলেন। তাদেরি একজনের সঙ্গে একটী মেয়ের প্রেম-কাহিনীর ইতিহাস। বইখানা আমেরিকাতেও নাকি প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

গল্প এবং উপন্যাস ছাড়া তিনি *Thoughts of an Unpolitical Man* নাম দিয়ে একখানা প্রবন্ধ পুস্তকও প্রকাশ করেন। এ-বইয়ে টমাস্ ম্যান্-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

টমাস্ ম্যান্ মানব-অন্তরের পরম সত্য ও সৌন্দর্য্যকে অপূর্ব্ব শক্তিময় বলে প্রচার করেছেন। যে-আদর্শের আলোকে তাঁর সকল জীবন উদ্ভাসিত, তারি প্রকাশ তিনি দেখতে চান্। তাই দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম ক'রে যে মহত্তর জীবনের ছায়া তিনি মানুষের ভেতরে প্রত্যক্ষ করেছেন, তারি অভিব্যাক্তিতে তাঁর সকল রচনা মহিমান্বিত।

মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের গৌরবে এ-পৃথিবীতে স্বর্গপুরী প্রতিষ্ঠা করবে, এই তাঁর জীবনের স্বপ্ন। আনন্দ-বেদনার রঙে তিনি যে-ছবি এঁকে চলেছেন, তা' এই জগতের সকল নীচতা, সকল দৈন্যকে ছাপিয়ে মহত্তর জীবনের আভাসে পরিপূর্ণ।

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

যোগ্যতা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সোণা হয়ে গেছে অঙ্গ সোহাগে সোহাগে
অমৃত হয়েছি আমি তব অনুরাগে।
যারা মোরে চেয়ে দেখে তারা দেখে কী-বা
ধাঁধায় তাদের চোখ আমার এ বিভা।
তুমি মোরে ছুঁয়ে দেখ তুমি দেখ সব,
তুমি জানো, আমি নই নিতান্ত মানব।
তোমারি সে ছোঁয়া লেগে আমি দীপ্যমান
আদিত্য সভায় খুঁজি আমার সমান।
প্রতি চুম্ব' প্রতি সূর্য্য প্রতি অঙ্গে মম
প্রতি আলিঙ্গন জ্বলে সৌদামিনী সম।
এ তনুমণ্ডলে নাই হেন তুচ্ছ স্থল
যারে তুমি করো নাই উত্তাপ-উজ্জ্বল।
অয়ি স্বয়ম্বরা নারী, তব মাল্য-লতা
আমাতে ছুঁয়ায়ে দিল আমার যোগ্যতা।

রক্তের রঙ্গ

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

নিরবচ্ছিন্ন চাপা অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোছনার নির্ম্মল স্নিগ্ধতা ; কপিলের অন্তরের ভিতর দুরন্ত অন্ধকারে আজকের এই মুক্তিটুকু যেন জ্যোছনার মতই স্নিগ্ধতা আনিয়া দিয়াছিল।

কপিল গিয়া আলির কাছে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—খবর কি আলি ? কতক্ষণ বসে' আছ ?

আলি মাথা তুলিল না। বলিল তোমার দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত বসেই থাকতে হোত। সে যাক্। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে এখান থেকে চলে যাবে বলেছিলে, তার কি হোল ?

কপিল এ কথা শুনিবে বলিয়া প্রস্তুত ছিল না। কথাটা শুনিয়াই তাহার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কপিল একটু ভাবিয়া উত্তর করিল,—যাব না বলেই ঠিক করেছি।

কথার মধ্যে একটু ঝাঁঝ্ ছিল।

আলি মাথা তুলিয়া এবার একবার কপিলের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল তুমি জেনে শুনে কারুর অনিষ্ট কর না, এ বিশ্বাস আমার আছে—তাই জান্‌তে চাই তুমি নূরকে অব্যাহতি দেবে কি না ?

কপিল জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে ?

আলি বলিল, মানে তুমি জান। তুমি জান, নুর তোমাকে ভালবাসে। তোমাকে ছাড়া তার জীবনের আর কিছু আরাধ্য নেই। এখন এ ভাবে আর চলে না। তুমি গ্রহণ করবে না, এ আমি জানি—অন্য দিকে তার সঙ্গে তোমার মিলনও সম্ভব নয়, এও তুমি জান। কারণ, বাবা মা এতে সম্মত হবেন না। তাই সব দিক বিবেচনা ক'রে কি তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল নয় ?

কপিল একটু ব্যাঙ্গের স্বরে বলিল, এতদিন পরে হঠাৎ আজ এ কথা মনে পড়ল ?

আলি উত্তর করিল, এতদিন পরে ঠিক্ নয়। অনেক দিন থেকেই ভাব্‌ছি, কিন্তু তোমাকে বল্‌তে সাহস হয় নি। একদিন তুমি চলে যাচ্ছিলে, আমিই তোমাকে জোর করে রেখেছিলাম, সেকথা আমার মনে আছে। কিন্তু এখন একেবারে নিরুপায় হয়ে তোমাকে বল্‌ছি, তুমি নূরকে ছেড়ে দাও।

কপিল ভাবিল, হায় অদৃষ্টের বিধাতা ! সকল দিক ছাড়িয়া দিয়া জীবনের সীমান্তে আসিয়া একান্ত নিরালায় নীড়টুকু বাঁধিয়া দিন কাটাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু মানুষের এ কি অত্যাচার ! তাহাদের দরকারে কপিলকে সে-বাসাও ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে !

কপিল ধীরে ধীরে বলিল, তোমার কি মনে হয়, আমি ছেড়ে চলে গেলে তোমাদের সুবিধা হবে ?

আলি বলিল, তা ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে এখন ত তাই মনে হয়। বহু দিনের অসাক্ষাতে যদি নূরের মন থেকে এ ঘটনার স্মৃতি মুছে যায়, এই আশা ! আজ তুমি আমাদের বাড়ী যাও নি, সে যে সারাদিন কি করেছে তার জন্যে, তুমি যদি তা' নিজে দেখ্‌তে, তা' হলে তোমারও পাষাণ প্রাণ গলে যেত। এত অসহায় নারী—বেশ বুঝ্‌তে পারছিলাম, তার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তবু সে

নীরবে এই ব্যথা সহ্য করে গিয়েছে। অজ্ঞাতে হয় ত চোখের জল বেরিয়ে এসেছে, তাও সে লুকিয়ে মুছে ফেলেছে। তার ওপর মা বাবার সামনে তাকে ঠিক সাধারণ ভাবেই থাক্‌তে হয়েছে। একি কম কথা! দা-ঠাকুর, তুমি বুঝবে না নূরকে তুমি কি করেছ। যদি সম্ভব হোত আমি তোমার ওপর এর প্রতিশোধ নিতাম, কিন্তু আমি নিজেই জানি এতে তোমার বিশেষ কিছু অপরাধ নেই, যদি থাকে তা' আমার। তাই তোমার ওপর আমার গায়ের জ্বালা মেটাতে পারছি না। নূর আমার বোন্‌, তার এ কষ্ট আমি জেনে শুনে সহ্য করতে পারি না। আজ তাই তোমাকে মিনতি করে বলছি—তুমি যাও, যাও—চলে যাও। যদি সম্ভব হয় কালই।

কপিলের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু আলির চোখ এড়াইতে পারিল না।

আলি বলিল, ঐ চোখের জল! এই নিয়ে লোকে হাসে ঠাট্টা করে, কিন্তু বুকের কত নাড়ী ছিঁড়ে যে এই চোখের জল বের হয়, মানুষ অপরকে বিদ্রূপ করবার সময় তা ভুলে যায়। আজ তোমার চোখের জল দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে চেনা খুব সহজ। এতদিন শুধু বৃথাই ভেবেছি, তুমি আশ্চর্য্য লোক।—তুমিও কাঁদ দা-ঠাকুর?

কপিল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া থাকিল।

দুজনেই চুপ করিয়া আছে এমন সময় অন্ধকারের আড়াল দিয়া একটি রমণী-মূর্ত্তি তাহাদের দিকে আসিতেছিল। কপিল দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

রমণী আসিয়া কপিলের সম্মুখে দাঁড়াইল।

কপিল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, বোস নূর।

আলি অবাক হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি করেছিস্‌ নূর? একলা চলে এসেছিস্‌ এখানে? যা' যা' শিগ্‌গীর ফিরে যা নূর।

নূর শান্ত ধীর পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। আলির কথার উত্তরে শুধু ঘাড় নাড়িল।

আলি আরও অস্থির হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—মা, বাবা?

নূর ধীরে ধীরে বলিল—তাঁরা জানেন আমি এখানে এসেছি। আমি বলেই এসেছি।

আলি উত্তেজনায় একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, নূরের কথা শুনিয়া আবার বসিয়া পড়িল। কিন্তু এমন চঞ্চল হইয়া পড়িল যে বলিবার নয়। যেন কি বিপদই হইয়াছে, কি এখন করা উচিত তাহা যেন এ মুহূর্ত্তে ঠিক হইয়া যাওয়া প্রয়োজন, এমনই একটা ভাব।

নূর আলির এ ভাব লক্ষ্য করিল।

কপিল আবার বলিল, নূর বোস।

নূর একটু হাসিয়া কপিলের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে কটা কথা আছে।

কপিল জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি এখুনি, আজই বলা দরকার?

নূর ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া খানিকক্ষণ কপিলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

কপিল নূরের কাছে গিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, নূর আমার কথা রাখ, আজ বাড়ী যাও। আমি কাল গিয়ে নিশ্চয় তোমার কথা শুনে আস্‌ব।

নূর বলিয়া উঠিল, না, তুমি আর ও-বাড়ীতে যেও না।

কপিল এবার একটু হাসিল। তারপর বলিল, যাওয়া যদি দরকার হয়, তা, হলে যাব বৈ কি! তার জন্য তোমার কোনও ভয় নেই।

নূর ব্যস্তভাবে বলিল, না, না, যেও না—আমি বারণ করছি।

কপিল জিজ্ঞাসা করিল, কেন বল ত?

নূর বলিতে লাগিল, পাড়ার লোক ভীষণ ক্ষেপেছে। তুমি এখানে আর থাক্‌তে পারবে না। তারা এমন ক্ষেপেছে যে, তোমার জীবন সম্বন্ধেও তুমি এখন আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার না। সেই কথাই আমি বল্‌তে এসেছিলাম।

কপিল বলিল, তাই নাকি?—চল আমি তোমাদের দু'জনকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

আলি অসম্মত হইয়া বলিল, না, কাজ নেই। নূর যা বলল একথা আমিও তোমাকে বল্‌তাম কিন্তু কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি। আমাদের আত্মীয়রা তোমাকে পেলে খুন করবে।

কপিল কহিল, এলেই পারেন তাঁরা এখানে— আমাকে পাওয়া ত খুব কঠিন নয়। আর তা' ছাড়া আমি একা— তবে খুন আমাকে করলে তাঁরা বিপদে পড়বেন কারণ আমি সরকার বাহাদুরের নিশানা-করা আসামী। আমার জীবনের মূল্য তাঁহাদের কাছে অনেক।

আলি ও নূর কপিলের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কপিল তাহা দেখিয়া বলিল, অবাক হওয়ার এতে কিছু নেই। আমি অত্যন্ত একটা সাধারণ মানুষ—কিন্তু পাকে-প্রকারে নানা রকম ঘটনার টানে পড়ে কেমন একটু অসাধারণ হয়ে পড়েছি। আমার নিজেরই এক এক সময় হাসি পায়। কত বড় কাপুরুষ আমি, অথচ লোকের ধারণা আমি মস্ত একটা সাহসী লোক। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না আমি শুধু ছটি অন্নের জন্য দেশলাইর কলে কাজ করি; থাক্‌বার আর চুলো নেই বলে এই কুঁড়েটুকু বেঁধে এখানে বাস করছি। তেলের পয়সা থাকেনা বলে ঘরের ভেতরটা যখন অন্ধকার থাকে, তখন পুলিশের লোক ভাবে আমি না জানি কি ভীষণ ব্যাপারই ভেতরে বসে করছি। হাত পুড়িয়ে খেতে ইচ্ছে করে না বলে' যখন যা' তা' খেয়ে থাকি, তখন লোকে বলে আমি কত বড় একটা ত্যাগী। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার নিরালা মন যখন কেঁদে ওঠে, চোখ যখন জলে ভ'রে ওঠে, তখন লোকে বলে অন্ধকারে আমার চোখ আগুনের মত জল্‌তে থাকে। এইত আমার অবস্থা— ভয় আমার সবই আছে, তবে ভয়ের কথা আর ভাবতে ভাল লাগে না, এই যা। যাক্ সে সব কথা—চল তোমাদের এগিয়ে দিই।

নূর খুব অস্পষ্টস্বরে বলিল, তোমার কথা আমি ফেরাতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। কিন্তু আমি আর ফিরে যাব না বলেই আজ এসেছিলাম।

কপিলের মনে বোধ হয় একটু ব্যথাও লাগিল কিন্তু তবু সে মৃদু হাসিয়া বলিল, নূর, আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে? সমাজে আমার স্থান নেই, কাজ কর্ম্মের আমার কোনও স্থিরতা নেই, আমার জীবন সর্ব্বদাই বিপন্ন, এ অবস্থায় আমি তোমাকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াতে নিষেধ করছি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি, আমারই দোষে, আমারই কতকগুলি ভড়ং দেখে তুমি আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছ। আমার জীবন কিন্তু ঠিক তা নয়। এটা সত্যি কথা—আমি ভালবাসার কাঙাল, কিন্তু আমি এও আজ বুঝি, আমি যে-ভালবাসা চাই তা পাবার উপযুক্ত আমি নই। যে আমাকে ভালবেসে তার সর্ব্বস্ব দেবে, আমি তাকে বাইরের দিক থেকে কিছুই দিতে পারি এমন সামর্থ্যটুকু আমার নেই। শুধু শুধু কাউকে নিয়ে মোহের বশে খেলা করা আমার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি দুইয়েরই বিরুদ্ধ। তাই আমি তোমাকে মিনতি করছি—তুমি আমার কথা ভেবে নিজেকে নষ্ট করো না। তবে এও বলি—তুমি কেন, আজ যদি তোমার মত কোনও মেয়েকে আমার পাশে পেতাম, আমার চিন্তার সঙ্গিনী, আমার দুঃখের ভাগিনী, আমার আনন্দের বান্ধবী তা হলে আমি তাকে দেবীর সম্মানে বুকে তুলে রাখ্‌তাম। কিন্তু তা হয় কি করে? তা হয় না। তাই আমি ঐ কল্পনার ঐশ্বর্য্য নিয়েই থাক্‌তে রাজী আছি— বাস্তবের আঘাতে জর্জ্জরিত হবার মত শক্তি আমার আর নেই।

নূর প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে কপিলের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। কপিল তাহার মুখের দিকে চাহিতেই চারিচক্ষু মিলিত হইল।

ধীরে ধীরে নূর বাইরের সেই খাটিয়াটার উপর বসিয়া পড়িল। খুব স্পষ্ট স্বরেই বলিল, আমি যাব না।

কপিলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিয়া সে এ বিপদ হইতে নূরকে উদ্ধার করিবে, ভাবিয়া পাইল না। অনেক মিনতি করিয়া, অনেক বুঝাইয়াও নূরকে কিছুতেই টলাইতে পারিল না। শেষকালে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত কপিল বলিল, তোমার রূপ, তোমার যৌবন যেদিন নিঃশেষে শেষ হয়ে যাবে সে দিন? সেদিনের কথা ভেবেছ কি নূর? আমি যে তোমাকে ছিন্নবস্ত্রের মত ফেলে রেখে চলে যাব, এ কথা কি তোমার একবারও মনে হয়েছে?

নূর মাথা নীচু করিয়াছিল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

কপিল বলিল, তবে? এ কথাও ভেবে দেখো। —তুমি আসবে আমার কাছে সর্ব্বস্ব ছেড়ে, তারপর একদিন জোয়ারের জল যখন ফিরে চলবে, তখন তোমার কি দশা হবে তারই কথা তোমাকে বোঝাতে চাই। হয় না কি? হয় নূর। ভালবাসা অটুট অক্ষয় হয়ে থাকে; জোয়ার ভাটায় সমান তালে চলে—ছন্দ তার অপরূপ, অম্লান। কিন্তু তোমার আমার কথা নিয়েই এ ক্ষেত্রে বিচার করা দরকার। জাতিতে আমরা ভিন্ন, প্রকৃতি ও বিশ্বাসে হয়ত সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। অবস্থা আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি গৃহহীন পথবাসী, তুমি গৃহের লক্ষ্মী, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। তোমাকে এ আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনতে চাই না।

তারপর নূরেরর হাত ধরিয়া কপিল বলিল, চল, নূর বাড়ী চল।

নূর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

আলি পূর্ব্বেই কিছুদূর গিয়া উহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনজনে পথ চলিতে চলিতে প্রথমটা কেহ কোনও কথা বলে নাই।

কিছুদুর গেলে আলি কহিল, দা'-ঠাকুর, নূরের তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে!

কপিল অপরাধীর মত উত্তর করিল—আমি জানি তা। নূর ঘরে বন্দী থাকবে, তার পক্ষে এখন কিছু কাল খুবই দুঃখের দিন হবে।

কপিলের কথা শুনিয়া নূর একবার কপিলের মুখের দিকে তাকাইল। ঐ দৃষ্টির মধ্যে প্রচণ্ড তিরস্কার, কি বিপুল আর্ত্তনাদ তাহা কপিলের বুঝিতে দেরী হইল না। তবু সে সব দিক বাঁচাইবার জন্য নিজেরই ঘাড়ে সব অপরাধ লইয়া হাসিয়া বলিল, কিছুদিন কেটে গেলে সব মুছে যাবে।

এবার কপিল চাহিল নূরের দিকে।

নূর বলিল, আমি জানি একথা তুমি বিশ্বাস করনা।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা আলিদের বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রাত্রি তখন অন্ধকারের পথে যাত্রা করিয়াছে।

আলিদের বাড়ীর সম্মুখেই ছোট একটু মাঠ—মাঠের মাঝখানে একটা শালগাছ। তারই তলায় আসিয়া নূর দাঁড়াইল। কপিলের হাত দুখানি লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। এই প্রথম নূর এতখানি ব্যাকুলতা দেখাইল। তরুণী নূরের কোমল হৃদয়ের এই ব্যথা অনুভব করিয়া কপিল নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। অক্ষমতা তাহার এত পরিমিত—অক্ষমতা তাহার এত সুপ্রচুর!

নূরের দুইচোখ বহিয়া ব্যথার অশ্রু তরল অন্ধকারের মত অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আলি তাহাদের দাঁড়াইতে দেখিয়া বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তবু নূর কোন মতে বলিল, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। এখানেই কোথাও আছ, এটুকু ভাবতে পারলেও আমি বাঁচব।

আর তাহার কথা বলা হইল না।

কপিল মাথা নত করিয়া শ্রদ্ধায় আপ্লুত কণ্ঠে স্তোত্রের মত উচ্চারণ করিল—তুমি পবিত্র, তুমি মহিয়সী, তুমি নারী, তুমি জীবনস্রোত—তোমার ইচ্ছা পালন করব।

তারপর পাগলের মত হাত ছাড়াইয়া লইয়া কপিল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

আকাশের একটি ব্যথাতুর নক্ষত্র উভয়ের এই দুঃসহ বিরহের সাক্ষী রহিল।

ক্রমশ—

পাটের ক্ষেতের মায়া

শ্রীমনোজ বসু

ঘন কাজল পাট
ঘাড় দোলাইয়া দেয়ালা করে, নীল-মাণিকের হাট !
জোয়ার পানি খেলা করে—খেলে আলো ছায়া—
পাতায় পাতায় ঠাসাঠাসি পাটের ক্ষেতের মায়া !
গেল-বছর চৈতমাসেতে তিন্‌টে বেচ্‌লাম গাই—
গোয়াল কাঁদে ডাক ছাইড়্যারে—
তিনটে দিন আর গোয়াল পানে নজর তুলি নাই।

গাই বেইচ্যা না টাকা হল চার কুড়ি আর দুই,
জমি কিনলাম বেশী নয় সে কাঠা দশেক ভুঁই।
বারোবেঁকীর খাল চেনো ভাই ?—শামুকপোতার চর ?
সেইখানে মোর সোণার ক্ষেত ঐ গড়ই গাঙের পর।
আর পারেতে তালের সারি—
দীঘল গাছের দেমাক্ ভারী—
মাথার উপর মেঘের বোঝা, পায়ের গোড়ায় ধান ;
ধানের গোছা দেইখ্যা যে প্রাণ করে রে আন্‌চান।
গোছার গোড়ায় জল নাচে আর মাথায় নাচে রোদ,
বাদল আস্তা যায় ভিজায়ে, হায় রে কি আপদ !
গাঙের সাথে পাল্লা দিয়া ছুট্‌তেছে ধান বন—
খানিক খানিক, পাটের ক্ষেতে মুখ ঢাকে কেমন !
একপো-ভাঁটির পথ এমনি ধানে-পাটে ঢালা—
তাই ছাড়ায়ে তবে গে ওই হাটের টিনের চালা !
হাটুরে না গাঁয়ের কত
ছোটে তীরের ডগার মতো —
দাঁড়ীরা সব সারি গায় আর যায় রাত বিরেত—
ক্ষেত ভরা মোর কাজলা পাটে—
এবার যেদিন যাবি হাটে,
দেখিস চায়্যা সোণামুখী আমার পাটের ক্ষেত।

আষাঢ় মাসে তালের জটায় মেঘের পরে মেঘ,
ভর কোটালে পাড়ের ভাঙন, জলের বড় বেগ !
বকের ঝাঁকে একপা তুইল্যা বেড়ায় গাঙের চরে—
কেয়াবনের বাস যে আসে—মনটা কেমন করে !
বানের মত বেগে চলে ইল্‌শে ধরা না'
গাছের ফাঁকে ইঁটের পাঁজা সূর্য্যিপুরের গাঁ।
বর্ষা করে মস্করা রে—হাওয়ার পিঠে চড়ে।
টোকা নিতে দেয় না যে আর
একেবারে তুড়ুক-সওয়ার
গা-মাথা সব ভিজাই' দিয়া কোথায় সইর‍্যা পড়ে।
তখন মোরা ভাইপো খুড়ায় চষি সোণার ভুঁই
লাঙ্গল-ফলায় কালোমাটী—
—মেঘের মতো কালোমাটী, বলব কি আর মুই।
মাটী চ'ষে, ঢেলা ভাঙি আমরা গো দুইজনা।
আহা, মাটী নয় সে কাজল-লতা ! ফল্‌বে গো ঠিক সোণ
বীজ বুনে ভাই, ঘরে আইলাম পার হইয়া খেয়া,
তামুক টানি, দোয়া মানি—
এ দুটো দিন বাদলা না হয় ধইর‍্যা থাকে দেয়া !
রাত-দুপুরে ঘুম আসে না—
রা মানে না চোখের পাতা দুটি
ভোর না হতে—উঠি-পড়ি—
ঘুমোল্ চোখে ক্ষেতের পানে ছুটি।
খুইজ্যা—খুইজ্যা—খুইজ্যা—খুইজ্যা—
দেইখ্যা—দেইখ্যা সারা
গজাইছে কি নয়নমানিক—আহা, গুড়া গুড়া চারা।

তিনদিন বাদে দেখলাম বটে—দেখলাম বটে ঠিক্
অগুণ্‌তি সবুজ চারা রে—চান্দ্ যেন দেয় চিক্ !

পাট ঝাড়ে—মুই পাইট্ করি। দুপুর সকাল সাঁজ
পইড়্যা থাকি একা একা কাজলা ক্ষেতের মাঝ।
—একা কেনে ? একলা না ভাই।
ফুটফুটে ঐ চারাগুলা হাসে
সারাটা দিন ঘাড় দোলায় মোর হাঁটুর কোলের পাশে।
মুই, ঘাস বাছি আর সোহাগ করি—
যে চারাটা হেইল্যা পড়ে সোজা কইর‍্যা ধরি—।
ঠিক দুপুরে লঙ্কা-পোড়া, পান্তা এবং আরো কত কি,
শানুক ভইর‍্যা লইয়া আসে মোড়লের বাড়ির ঝি।
তারে বলি হাস্তা হাস্তা—ও মোড়লের মাইয়া,
এরা মোদের কচি ছাওয়াল—দেখিস্ কি রে চাইয়্যা ?
সাম্‌লে আসিস্—আইলের উপর সাম্‌লে ফেলিস্ পা
ফুটফুটে ঐ চারায় যেন চরণ পড়ে না।—
সে দেয় মোরে ভাত বাইড়্যা, আর আমি তুলি ঘাস—
পাটের বনে সোনা ছড়ায় চান্দ মুখের তার হাস।
বাঁধাল পথে রোদের তাপে ঠাইস্যা ঝরে ঘাম—
আমার মাথার টোকা নিয়া তার মাথায় দিলাম।
কইলাম রে—বউ, টোকা মাথায় ফিরিস্, যে রোদ্দুর !
ফেল্লায়ে টোকা নথ নাড়ায়ে কয় সে হাস্তা—দূর্ !

আজকে যে সেই পাটের ক্ষেতে পাতায় ঠাসাঠাসি
দিনে দিনে বাড়লো রে গাছ—শশী পুন্নমাসী !

আগায় রাঙা ঝিলিমিলি, সুরুয ওঠে পূবে—
আমার রোওয়া গাছের খাঁজে আমি যে যাই ডুবে !
নজর রাখি, গরু তাড়াই, বারমাস্যা গাই—
এমন ধারা ঘন পাট যে-জন্মে দেখি নাই !
খাড়াই সে কম নয় বলি ভাই, পাক্কা পাঁচ হাতি !
মোর, হাজার জোয়ান মরদ বেটা—
রইছে যেন চিতাই বুকের ছাতি !
জমিদারের পাইক আসে, আসেন মহাজন,
সবারে দেখালাম ক্ষেত—ভয় করি আর কোন্ ?
নিত্যি আইস্যা জোয়ার-পানি গোড়া ধুইয়্যা যায়,
আড় পারের ঐ তালের সারি অবাক হইয়া চায়।
তিতির ছোটে ফাঁকে ফাঁকে—শালিক বাঁধে বাসা
গাঙের চরে কাঁকড়া ধইর‍্যা
শিয়াল গুলার কেবল যাওয়া আসা।
ধুচনী নিয়া মোড়লের ঝি তুল্‌তে আসে শাক,
কইলাম তারে—শাক-তোলা বউ, এখন না হয় থাক।
কি ফসল ফলেছে দেখ্, দশ কাঠা ত ভুঁই,
ক্ষেত ফলেনি, ফল্‌লো কপাল দেখ্‌তেছিস্ না তুই ?
আগন মাসে বেচবো রে পাট বাইশ টাকা মণ,
রূপোর বাউটি গড়্যাই দেবো—দেখিস সে কেমন !
ঘন কাজল পাট
ঘাড় দোলাইয়া দেয়ালা করে নীল মাণিকের হাট !
এবার যে দিন হাটে যাবি, ডিঙ্গা খানি ভিড়্যা'—
দেইখ্যা যাস রে সোনার ক্ষেত, রইল মাথার কিরা
—বন্ধু, রইল মাথার কিরা।

চলচ্চিত্র

ডি, আর

পূর্ব্বে কয়েক সংখ্যা 'কল্লোলে' আমি আপনাদের কাছে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা করেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকে হয় ত বায়স্কোপ সম্বন্ধে ইংরাজী বই পড়ে সে-দেশের ছবিতোলা ব্যাপারের অনেক কিছু কথা জান্‌তে পেরেছেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের আমি একটি কথা বলতে চাই। সে দেশের ছবিতোলা ব্যাপার, আর আমাদের দেশের ছবিতোলায় অনেক তারতম্য আছে। কাজেই আমি সেই দিক থেকেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এ দেশের কথাই বলতে চাই। এমনকি সমগ্র ভারতবর্ষের অন্য স্থান সব ছেড়ে দিয়ে শুধু আমাদের বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বলব। এর আগে আপনারা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে যে সাধারণ কয়েকটি বিভাগ আছে, তার কথা জান্‌তে পেরেছেন। এবার আমি একটি একটি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। কোনও ইংরাজী বই থেকে পড়ে' না লিখে আমার অভিজ্ঞতায় এ দেশের সুবিধা অসুবিধা থেকে যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা।

এখন বাঙলা দেশে ফিল্ম তোলার খুব ঝোঁক্ পড়েছে। এটা একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায়। আমরা যদি এতে উন্নতি করতে পারি, তাহলে আমাদের বেকার-সমস্যার অনেক পরিমাণে সমাধান হবে—আমাদের দেশের টাকা বিদেশী বণিকের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে—এ দেশের টাকা ও অপর দেশের টাকা আমাদের দেশে সঞ্চিত হওয়া সম্ভব হবে। তবে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি—এ ছবি-তোলা ব্যবসায়ে সকল বিভাগেই শিক্ষিত লোক যোগদান করা একান্ত প্রয়োজন। এতে যোগ দিলে লোকের চরিত্র নষ্ট হয়, একথা যাঁরা অনুমান করেন তাঁরা শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচির লোক সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত কোনও ফিল্ম ষ্টুডিয়ো দেখেন নি' এ কথাই আমি বলব। এটা একেবারে সম্পূর্ণ অসত্য কথা যে, এ লাইনে এলেই লোকের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। যাদের সন্ধির ধাৎ, তাদের কিসে কখন যে ঠাণ্ডা লাগে তা অনুমান করা কঠিন। এ পথেও তাই। ধাৎ যার যেমন, তার তেমনি চরিত্রহানি হওয়া সম্ভব। তবে যে-studio-তে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রসন্তানরা এক সঙ্গে কাজ করেন, সেখানে ইচ্ছা করলেও অপরের বা নিজের চরিত্র নষ্ট করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এটুকু খুব অস্পষ্ট ইঙ্গিত হলেও এটা খুব সত্য কথা। কাজেই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ও মহিলারা এমনি ভাল ভাল সব studio বেছে বেছে অনায়াসে নিঃসঙ্কোচে যোগদান করতে পারেন। আমি এখানে উদাহরণরূপে একটি studio-র কথা বলব। এ studio-তে আমি কাজ করেছি। এখানে ভদ্রলোকের ছেলেরা ও এদেশীয় এবং বিদেশীয় মহিলারা কাজ করেন। এখন পর্য্যন্ত এই studio-তে ভয় পাবার মত কোনও দুঃসংবাদের কথা আমি শুনিনি। অনেকের ধারণা ফিল্ম studio-তে যারা কাজ করে, তারা প্রায়ই মদ্যপায়ী হয়। এ studio-তে আমি কারুকে মদ খেতে দেখিনি। কেউ যদি বাইরে বা নিজের ঘরে বসে খায়, তার কথা আমাদের জান্‌বার দরকার নেই। আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রেরই একটা গোপন পথ আছে, তা' থাক্; তা' দ্বারা বাইরের সঙ্গে, সমাজ বা কাজের সঙ্গে কোনও সংঘাত না ঘটে এইটেই হোল, আসল কথা। এই studio-তে মেয়েরা studio-র গাড়ী করে কার্য্যক্ষেত্রে আসেন। মহিলাদের প্রত্যেকের জন্য সাজঘর আলাদা। এই studio-র প্রত্যেক লোক এখানকার মহিলাদের অত্যন্ত সম্মান করে চলেন। মেয়েরাও সকলের সঙ্গে খুব সহজ ভাবেই মেলামেশা করেন। একটি বৃহৎ পরিবারের মত এই studio. আমার মনে হয় প্রত্যেক Producing কোম্পানীরই এ-ধরণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা হলে

শিক্ষিত আর্টিষ্ট পেতে আমাদের বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না। আজ কাল ত মেয়েরা নিজে উপার্জ্জন করছেন। ফিল্ম আর্টিষ্ট হলেও তাঁরা পারিশ্রমিক যথেষ্ট পাবেন, অথচ নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। এমন কি এমন দিন আসতে পারে—যখন আমাদেরই কোনও ভগ্নী এই নিজ প্রতিভা ও একাগ্রতার গুণে জগতের মধ্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থও আস্‌বে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বাঙলা দেশেই এ ব্যাপার হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে ফিল্ম ব্যবসায়ে বাঙলা দেশের যে প্রধান অন্তরায় টাকার অভাব, তা যে কি করে' দূর হবে তা বলা শক্ত। বাঙালীরা এ ব্যবসায়ে টাকা দেয়নি তা নয়। ধনীরা বহুবার এ ব্যবসায়ে টাকা দিয়েছেন—গ্রহ বৈগুণ্যে সেসকল প্রতিষ্ঠানগুলি হয় ত কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। তার জন্য আজকাল ধনীরা এবং জনসাধারণ এই ব্যবসায়কে এবং যাঁরা এ ব্যবসায় করতে নামেন তাঁদের একটু সন্দেহের চোখেই দেখেন। এজন্য ধনীদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজও অনেকে ত অনেক ব্যবসাতে সাহায্য করছেন। তবে ধনীদের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা যে টাকা দিচ্ছেন, তা' কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সাহায্য করবার নয়, একটা ব্যবসাতেই তারা টাকা দিচ্ছেন এবং এ থেকে লাভ হলে তার অংশ তাঁরা পাবেন। সুতরাং একটি নূতন ব্যবসায়তে টাকা দিচ্ছেন এ কথাই তাঁরা ভাব্‌বেন এবং এ থেকে তাঁদের লাভ হবে এ কথাই মনে রাখ্‌বেন।

আমাদের দেশে ফিল্ম প্রডিউসিং লিমিটেড্ কোম্পানী দুই একটি হয়েছে; দু' চার বছরের মধ্যে হয় ত আরও হবে। জনসাধারণ শেয়ার না কিন্‌লে কোনও লিমিটেড্ কোম্পানী দাঁড়াতে পারে না। তাই যাঁরা কোম্পানী গড়্‌বেন তাঁদেরও উচিত প্রত্যেক ছোট বড় অংশীদার যাতে, কোম্পানী যে তাঁদের নিজের, এ কথা মনে কর্‌বার সুবিধা পেতে পারেন। কোম্পানীর কাজ কখন কতটুকু হচ্ছে বা হবে, তা বাড়াবাড়ি করে জয়ঢাক না বাজিয়ে সত্যিকারের কতখানি কাজ এগুলো তাই অংশীদারদের জানান উচিত। যাঁরা অংশ কেনেন তাঁরা কখনই ভাবেন না যে তাঁদের দু' দশটা শেয়ারের টাকা দিয়ে একটা নূতন কোম্পানী অমনি রাতারাতি সোণা ফলিয়ে দেবে। তাঁরাও বোঝেন যে, আমাদের দেশে সহস্র রকমের বাধা ও অসুবিধার মধ্যে একটা কোম্পানীর কতদিনে কতটুকু কাজ করা সম্ভব। তাই অংশীদারদের কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত রাখলে তাঁদেরই সহানুভূতি ও সাহায্যে কোম্পানীর সকল দিক দিয়েই লাভ হবার কথা। আশা করি আমাদের দেশের প্রডিউসিং কোম্পানী ও তার ম্যানেজিং এজেন্সি বা ডিরেক্টাররা এ কথাটি মনে রাখবেন। কোম্পানীকে একেবারে নিজের পাটা না মনে করে' জনসাধারণের রক্ত বিন্দু এই কোম্পানীতে আছে, এটুকুও মনে রাখ্‌বেন। তা হলে শেয়ার বিক্রী করতে এত বেগ পেতে হবে না। আজ যেটুকু কষ্ট হচ্ছে, দু' চার বছর পরেই পরস্পর সাফল্যের আনুকুল্যে সে কষ্ট আর থাকবে না।

যাঁরাই কোম্পানী গড়তে যাবেন তাঁদেরই বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, মাছের তেলে মাছ ভাজা, তা' প্রথম অবস্থায় চল্‌বে না; কাজেই যথেষ্ট টাকা হাতে না ক'রে এবং রীতিমত এষ্টিমেট না ক'রে যেন কোনও কাজে তাঁরা হাত না দেন্। দিলে পরে তাঁদের নিজেদেরও অশেষ দুর্গতি হয় আর যারা তাঁদের কর্ম্মচারী থাকে তাদের ত কথাই নেই—তারপর যারা ধনী ও অংশীদার, তাদের টাকার কোনও সদ্‌গতি হয়েছে বলে তাঁরা মনে করবার অবসর পান্ না। ঠিক্ দু'চার বা দশহাজার টাকায় এ কাজ হয় না। কি ধরণের কাজ করা হবে—অন্ততঃ এক বছরের মত সব দিকের আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরী করে' তারপর কাজে হাত দিলে কাজেও ব্যাঘাত ঘটেনা. কোম্পানীর কর্তৃপক্ষেরও মাথা খারাপ হয় না এবং যারা ধনী বা অংশীদার তাঁদেরও দুর্ভাবনার কারণ ঘটেনা।

ডায়েরী

শ্রীপরিমল গোস্বামী

১লা জুলাই—আমি যে আজও বে' করিনি, এ জন্যে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ। আমি প্রেমে পড়েচি। প্রেমে পড়া নাকি একটা রোগ। হোক না রোগ. যে রোগে এত আনন্দ, তাকে তাড়াতে চাই না।

গত রাত্রে তিনটি কবিতা লিখেচি। প্রেমে মানুষকে হঠাৎ কবি ক'রে তোলে। মনের মধ্যে জমা-খরচের অঙ্ক গুলো পর্য্যন্ত ছন্দে ভেসে বেড়ায়। তাদের ধ'রে কাগজে লিখলেই হ'ল। কিন্তু আমি যা লিখেচি, সে ত অঙ্ক নয়,—অঙ্কন। আমি কাব্যে ছবি এঁকেচি।—কালিদাস যেমন করে শকুন্তলার ছবি এঁকেছিলেন।

২রা জুলাই—আমার প্রিয়ার নাম আজ প্রকাশ করব। আজ তার চিঠি পেয়েচি। তাকে চিঠি বল্লে অসম্মান করা হয়—সে লিপিকা। চিঠি ত আমাদের গোমস্তাও লেখে :—সে আর এ, কি এক?

চপলাকে প্রথম দেখেছিলাম ট্রামের মধ্যে। শুধু আমি তাকে দেখিনি, সেও আমাকে দেখেছিল। অর্থাৎ সেই আমাদের চারি চক্ষের মিলন। পরিচয় মনে মনে হ'ল। তারপর সেও নাম্‌ল শিয়ালদ'—আমিও নামলাম শিয়ালদ। সে উঠল শ্যামবাজারের বাসে,—আমিও উঠলাম। আমাদের প্রথম কথা ফুটল এই বাসের মধ্যে চলন্ত ছবিতে যেমন এক মিনিটকে পাঁচ মিনিট, অথবা পাঁচ মিনিটকে এক মিনিট ক'রে দেখানো যায়—আমাদের পরিচয় অনেকটা সেই রকম। এখানে দশ মিনিট দশ বছরের কাজ করেচে।

বাসের মধ্যেই ঠিক করা গেল, দক্ষিণেশ্বর যাওয়া যাক। ওঃ সে দিনের স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে। গঙ্গার ধারে বসে তাকে বল্লাম—চপলা, আমরা উভয়ে উভয়ের জন্যে এতদিন প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌ছিলাম বিধাতার কারখানায়। আজকের এই যে মিলন এর মধ্যে আমি মস্ত বড় একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। জগতে প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করচে বলেই এতকাল ধরে তারা যার যার পথে চলচে, পথ ভুলে বিপর্য্যস্ত হচ্চে না। আমি ১৯০২ সাল থেকে জগতের পথে বেরিয়েচি, তুমি বোধ করি ১৯১২ সাল থেকে। এত দিনকার আকর্ষণে আমরা এইখানে মিলেচি। এ মিলন ধ্বংসের মিলন নয়,—এ প্রকৃতির অভিপ্রেত সৃষ্টির মিলন।

আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম, সে গঙ্গার দিকে চেয়ে ছিল। সূর্য্যাস্তের রাঙা আলো গঙ্গার ঢেউগুলোর ওপর লেগে ঝল্‌মল্‌ করচে—তারি লাল আভা চপলার মুখে এসে পড়েচে। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল! সেই দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করল। জিজ্ঞাসা করলাম—চপলা, আমাদের মিলন কি সৃষ্টির মিলন নয়?

চপলা আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌ল তারপর বল্‌ল—ওগো, দু'পয়সার পান কিনে আন না—আমার যা ছিল সব ফুরিয়েচে।

এই কথায় তার ওপর আমার ভক্তি বেড়ে গেচে।

৩রা জুলাই—পানের কথায় চপলার একটা মহত্ত্ব ও সংযম প্রকাশ পেয়েচে।...আমি বুঝতে পেরেচি, সে আমার ভালবাসার নিবেদন অগ্রাহ্য করতে পারে নি। আমার প্রত্যেকটি কথা তার বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন জাগিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের, অর্থাৎ পুরুষদের মনের কথা মনে রাখা অসম্ভব হয়; একটা প্রেরণা পেলেই বকতে থাকি, শোনবার লোক না থাকলে কাগজ কলম নিয়ে বসি—যেমন আমি বসেচি। কিন্তু মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র। ওরা অন্য সব বিষয়ে বড় চপল, কিন্তু হৃদয়ের বেলা অত্যন্ত গম্ভীর। তাদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে সেখানে প্রবেশ করি, এমন সাধ্য নেই,—আমরা

বাইরে থেকে আঘাত করি মাত্র। সে আঘাতে সহজে কোন ফল হয় না, অর্থাৎ চট্ ক'রে হৃদয়টা পাওয়া যায় না, এমন দেখা যায়।

৪ঠা জুলাই—আমার মনে এমন একটা উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্চে যে একদিনে একখানি বই রচনা করতে পারি। কিন্তু লিখতে বসলেই ঘুম পায়। তাই জন্যে এক দিনের কথা চার দিনেও শেষ হ'ল না। আজ সমস্ত দিন ঘুমিয়েচি, রাত জাগতে একটুও কষ্ট হচ্চে না। সুতরাং যতটা পারি লিখে ফেলি। চপলা সে দিন যদি পান না চেয়ে বলত, ওগো তোমায় কিছু বলতে হবে না, তুমি আমারি, তা হ'লে বোধ করি আমার উৎসাহ কমে যেত। যাকে অতি সহজে পাওয়া যায়, যাকে পাবার জন্যে কোন চেষ্টা করতে হয় না, তাকে ভালবাসা বড় শক্ত। আমি চাই এমন একজনকে, যাকে জয় ক'রে নিতে হবে—যেমন লোকে যুদ্ধ ক'রে দেশ দখল করে। আমি এক হাত এগুলে যে দু'হাত এগিয়ে আসে, পালায় না, তাকে রোমান্সের হিসাব থেকে বাদ দেওয়াই ভাল।

চপলা সহজে ধরা দেবার নয়, অথচ আমি যে তাকে সহজে ধরেচি, এটা আমার একটা ক্ষমতার গুণে। আমি না হ'য়ে আর কেউ হ'লে চপলার মত মেয়ের হৃদয় জয় করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ত, হয়ত সে হেরে যেত। আমি নিজেকে একজন সাধারণ লোক ব'লে কল্পনা করলেই বুঝতে পারি, আমার দ্বারা তাকে লাভ করা অসম্ভব ছিল, অতএব সে খেলো নয়।

যখনি মনে হ'ল সে আমাকে ভালবেসেচে, তখনই আমার চোখে তার রূপ বদলে গেল। তার চেহারার মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতে কোন বিশেষত্ব আমার নজরে পড়েনি, কিন্তু শেষে হল অন্য রকম। তার নাকটা প্রথমে মনে হয়েছিল একটু খাঁদা, কিন্তু শেষে মনে পড়ল, অ্যামেরিকার কোন প্রথম-পুরস্কার পাওয়া সুন্দরীর নাকও যেন সিনেমায় অনেকটা ঐ রকম দেখেছি।

তার চিঠিখানা পড়চি। লিখেচে—প্রিয়তম, তোমায় দেখিয়া অবধি আমি পাগলিনী হইয়াছি—আমাকে বাঁচাও। সেদিন তোমাকে কিছুই বলিতে পারি নাই—মুখে বলা কত কঠিন, তাহা বুঝিতে পার। আমি চিঠিতেও বিশেষ কিছু বলিব না। আমাকে যদি তুমিও ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে আমি পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই, আশা করি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। আমার ঠিকানা সেদিন জানাই নাই, আজও লিখিলাম না। যাহার সঙ্গে এই চিঠি পাঠাইতেছি তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি এই চিঠি পাইবামাত্র আমাকে পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইবে, বিশেষ দরকার। যদি পাঠাইতে সাহস কর তবেই বুঝিব...ইতি।

ভালবাসায় পাগল হ'য়েও চিঠিটা কেমন অল্প কথায় শেষ করেচে। ওরা বলে কম, কিন্তু না-বলা অংশটা ইঙ্গিতে এমন ক'রে বুঝিয়ে দিতে আমাদের চেয়ে ওদের সাহস ঢের বেশি। আমরা যতই বেশি লিখি—মনে হয় এতেও হ'ল না, কি যেন বাকি রইল। কিন্তু মেয়েরা জানে যে তাদের বেশি বকা রীতি নয়। আমাকে পরীক্ষা না করলেই হয়ত আমার মনে হ'তে পারত যে বোধ হয় ঠকলাম।

৫ই জুলাই—আজ আর একখানা চিঠি পেয়েচি। যে লোকটা চিঠি নিয়ে আসে তাকে দুটাকা বখশিস্ দিলাম। আমি জানি কি না যে-কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই কাজ লোকে আন্তরিক ভাবে করে। ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যানয়ার এবং স্যাটিসফায়ার—সেটার ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায় আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম-নিবৃত্তির মূলে ঐ দুটির একটি আছে।

আজ চপলা একটা কঠিন প্রশ্ন করেচে। তার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমি তার কি ভালবাসি! দেহ, না মন, না চেহারা, না আত্মা :—এমন একটা প্রশ্নের দরকার আমার নিজেরই ছিল। আজ নিজেকে বাজিয়ে দেখব, আমার এ ভালবাসা খাঁটি কি না।—সমস্ত রাত ভেবে ভোর সাড়ে তিনটের সময় লিখতে বসেছি। এটা দিন কি রাত আমার খেয়ালই নেই। এই ত চাই। জীবনের সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা যেটা, তাকে নিয়ে ত এমনি ভাবা দরকার।

—ওগো, আমি তোমার কি ভালবাসি, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না। তোমার দিকে যখন প্রথম চেয়েছিলাম, তখন তোমার চোখের ভেতর দিয়ে তোমার কোন্ অংশ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল তা বলতে পার? প্রথম ভালবেসেছিলাম সেইটিকে। তারপর ধীরে ধীরে যখন বুঝলাম যে আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হচ্চি, তখন তোমার সমগ্র দেহটাকেই ভাল-বেসেছিলাম। কেন না তোমার হৃদয়, তোমার দেহের প্রতি অণুপরমাণু ভেদ ক'রে আমার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করুক এমনি আকাঙ্ক্ষা হ'য়েছিল।

যে পাত্রে ক'রে তোমার প্রেমের মদিরা আমাকে উপহার দিচ্ছ, সে-পাত্রটিকে ত অগ্রাহ্য করতে পারি না। তার চেহারা কেমন হবে না হবে, আমার রুচির ওপর তার বিচার চলবে না। তুমি নিজ হাতে যে দানের ধারা আমার জীবন-পাত্র পূর্ণ ক'রে তুলবে, তার রং নীল হবে কি লাল হবে, সে প্রশ্ন ত মনে জাগে না। তুমি আমার কাছে একটি অখণ্ড রূপ। তাকে ভাগ করে দেখতে পারচি না। তোমার চুলগুলো পর্য্যন্ত আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেচে। তুমি যে তুমিই এই হচ্চে আমার একমাত্র লাভ। কিন্তু এও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সমগ্র তোমাকে ভালবাসি এ কথা থেকে আর এক কথা উঠচে। এখন যদি তোমার একখানা হাত অ্যাম্পুটেশনে বাদ যায়, তা হলে কি তোমাকে ভালবাসব না? তোমার দুটো চোখের একটি যদি হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায়, তা' হ'লে কি তোমাকে চাইব না? এ রকম দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তা হ'লে আমি যে হিসাবে সমগ্র চপলার কথা বলেচি, সে রকম সমগ্র চপলাকে ত পাব না। তা হ'লে কি আমার ভালবাসা কমে যাবে? ভেবে দেখলাম, মোটেই কমবে না। তা হ'লে এই দাঁড়াচ্চে, যে আমি তোমার হৃদয়কেই ভালবাসি। এই হৃদয়কে ধারণ করবার জন্যে যেটুকু আধার দরকার, অর্থাৎ তোমার দেহ, তাই যথেষ্ট। তোমার দুখানা হাত এবং দু'খানা পায়ের যদি একটিও না থাকে তা' হলেও চলে। অবশ্য এখন চলে, কিন্তু তোমাকে প্রথমেই যদি এই অবস্থায় দেখতাম, তা হ'লে চলত না।

আসল কথা, তোমার যে কি ভালবাসি, তা জোর করে বলতে পারচি না। এ রকম তত্ত্বকথার আলোচনা করলে দেখচি কেবল মন খারাপ হয়। সাধারণ লোকে যেমন ভালবাসে, সেই ভাল। তুমি এ রকম কঠিন প্রশ্ন আর তুলো না। তোমাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়তে পারব না, এ আমি বেশ বুঝেচি—সুতরাং কিছু চিন্তা কোরো না। আমাকে অন্য উপায়ে পরীক্ষা কর, আমি প্রস্তুত আছি।

এইখানেই আমার লেখা শেষ হ'ল। নিজেকে যাচিয়ে দেখতে গিয়ে বোঝা গেল যে, নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখবার ক্ষমতাও আমার মধ্যে নেই। ১লা জুলাইয়ের আগে যদি আমাকে ডায়ারি লিখতে হ'ত, তা হ'লে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চা খাওয়া কিম্বা সিনেমা দেখার কথা ছাড়া আর কিছু লেখার ছিল না। কথায় কথায় যদি হৃদয়ের কথা এসে পড়ত তা' হলে কি লিখতাম? লিখতাম যে ভালবাসা কাকে বলে তা আজ পর্য্যন্ত জানি না, যার নাম প্রেমে-পড়া, তা আমার ধাতে নেই। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার তফাতে আমার মনের গুপ্ত দুয়ারের সন্ধান পেয়েছি। এখন আমি যেন নতুন আর একজন আমি। আবার আরো দুদিন পরে আমি কি হব, তা আর আজ বলতে চাই না। অতএব আজ নিজের হৃদয়ের মধ্যে ডুব দিয়েও যে তার তল খুঁজে পেলাম না তাতে সঙ্কোচের কিছু নেই।

৬ই জুলাই—আগে দুখানা চিঠি ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় পেয়েচি, সুতরাং আজ যদি চিঠি পাই, তবে ঐ সময়েই পাব। এখন ৬টা—মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে, সুতরাং খাতা নিয়ে বসি। আচ্ছা, সে কি লিখবে, কল্পনা করা যাক। কিন্তু বড় শক্ত। আমি যা লিখেচি, তার উত্তর সরল ভাবে দিতে গেলে কোনো গোলমাল থাকে না। আচ্ছা, আমাকেই চপলা কল্পনা করি, এবং এরকম চিঠি পেয়ে আমি কি লিখতাম ভাবি। আমি লিখতাম—প্রিয়তম, তোমার চিঠি আমাকে মুগ্ধ করেচে। আমার ভয় ছিল, হয় ত বা এক কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় দেবে। তুমি যে আমাকে ধরতে এসে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েচ, এতবড়

ভুল ধারণা যে হয়নি, এতে তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। চোখ চাইলেই যার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাকে স্বচ্ছ বলতে পারি, কিন্তু তার মধ্যে ত কোন রহস্যের সন্ধান পাই না! কাচ স্বচ্ছ হয়েই মূল্য হারাল, কিন্তু হীরক? তার ভেতরটা দেখা যায় না, তার দিকে চাইলে বাইরে থেকেই চোখ ঝলসে যায়। তার হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু হৃদয়ের রংগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়! সেই সঙ্গে চোখ খুশী হয়, মন খুশী হ'য়ে ওঠে। তার কোন্ রঙ কোন্ রঙের সঙ্গে মিলে গেল, তাই বুঝে ওঠা দায়। এইখানেই তার রহস্যের আরম্ভ, কিন্তু তার শেষ নেই। আমরা ওতেই আবিষ্ট হই, অভিভূত হই—ওর বাইরে অথবা ওকে ছাড়িয়ে ভেতরে যেতে পারি না বলেই কাচ পাঁচ পয়সা ফুট, আর হীরক হাজার টাকা রতি।

কিন্তু আমার এ সব লেখা অন্যায়। এতে অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে—নিজেকে হীরকের সঙ্গে তুলনা করচি। না-ই করলাম। আমি যাই হই, আমার যে শেষ দেখতে পাওনি, এতেই তোমার ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ পেয়েচে '...ইতি।

এর বেশী আর কিছু লেখবার দরকার হ'ত না। তার চিঠি আসবার সময় হ'ল। তার হাতের লেখা একখানা চিঠির জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। মানুষের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যেটি, অর্থাৎ চোখ, তার অ্যানাটমী কাউকে পাগল করে না। যদি বা করে, সে হয় ত কেবল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের। কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যখন হৃদয়ের সকল মাধুর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, তখন তার দিকে চাইলে যে-কোন লোক পাগল হতে পারে। তেমনি এই হাতের লেখা। গোটাকতক অক্ষর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানোর ব্যাপার মাত্র। কিন্তু যখন এগুলো একটা গোটা হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, এবং বাসনার রসে সিক্ত হয়ে ওঠে তখন তা অক্ষরই হোক বা কতকগুলো কালির দাগই হোক; সোজা হৃদয়ের দরজায় এসে ঘা দেয়। ধূনো পোড়বার আগে সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন, কিন্তু যখন সে পোড়ে তখন অমূল্য,—তেমনি এই অক্ষরগুলো। চপলার চিঠি যখনি পড়ি, তখনি দেখতে পাই তারা পুড়চে—তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে চপলা—তার যা কিছু সুগন্ধ তা যেন চপলারই ভালবাসার সুগন্ধ—তার পূজার সুগন্ধ, আত্ম-নিবেদনের সুগন্ধ—এই জন্যে যে-লেখা আমার কাছে পৌছয় নি তার আগমনী আমার প্রাণে বেজে ওঠে। নইলে সাতটা বাজবার একঘণ্টা আগে মন চঞ্চল হবার আর কোন হেতু নেই।

এইবার দেখা যাবে আমার কাল্পনিক চিঠির সঙ্গে এখন-কার চিঠির কতখানি মিল। মিল অনেকখানেই থাকবে না, হয়ত কিছুই থাকবে না। কেননা আমরা যা ভাবি, তাই লিখি, কিন্তু ওরা যা ভাবে, তা নিশ্চয়ই লেখেনা। বরঞ্চ দেখতে পাচ্চি—মনের ভাব গোপন করতে এরা একটুও ইতঃস্তত করেচ না! দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না, তখন শকুন্তলার বলা উচিত ছিল—মশায়, আমিও আপনাকে চিনতে পারচি না। অনেক ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখচি, হৃদয়ের ভাব গোপন করতে পুরুষে এবং পশুতে পারে না, মেয়েরা খুব পারে।

এই মাত্র চিঠি পেলাম। আমার আন্দাজ ঠিক। লিখেচে,—প্রিয়তম, পরীক্ষা শেষ হয় নাই। পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইবে। ইতি।

কথা আরো সংক্ষেপ, কিন্তু টাকাটা ঠিক আছে। ছলনা হ'লে ক্রমশ টাকার অঙ্ক বাড়ত, কেননা চাইলেই ত পাচ্চে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লাগচে। যে লোকটা এসেছিল সে টাকা না নিয়ে চলে গেল কেন? এ যেন পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র দিয়ে লেখবার খাতা কেড়ে নেওয়া। এ সম্বন্ধে ভাব্‌তে হবে।

আমি ত তার কাছে কিছু চাইনি। চেয়েচি শুধু পরীক্ষা দেবার অধিকার। হয়ত এইটুকুই আমার অতিরিক্ত চাওয়া। সে না চাইতে যা দিয়েছিল—হয়ত তারই সম্মান রাখতে পারি নি। আজকের ব্যথা ছন্দে ফুটিয়ে তুললে যদি কিছু সান্ত্বনা পাই।

৭ই জুলাই—কাল কবিতা লেখা যখন শেষ হ'ল, তখন মনে হয়েছিল, আমার ডায়েরি লেখার কাজ শেষ হ'ল, কিন্তু আজ সকালে ডাকে যে চিঠি খানা পেয়েচি তাতে

আবার আমাকে তাজা করে দিয়েচে। সে লিখচে,—কাল আমারই ভুলে ঐরকম হইয়াছে। দারোয়ানকে যখন পাঠাই তখন তাহাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে তোমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে যখন ফিরিয়া আসে, তখন আর ভুল শোধরাইবার উপায় ছিল না। আমি তখন আর এক যায়গায় চলিয়া গিয়াছি। আজ আসিয়া সব বুঝিলাম। তুমি আজ আমাকে দেখিতে পার। আমার বাড়ি তোমার বাড়ি হইতে তিন মিনিটের পথ। তোমাকে আমি রোজই দেখি—তুমি আমাকে দেখিতে পাও না। অধীনার ঐকান্তিক অনুরোধ আর তুমি অবশ্য অবশ্য আসিয়া আমাকে বাধিতা করিবে। ইতি।

৮ই জুলাই—আজ আমি মস্তবড় সমস্যায় পড়েচি। এ চিটিটাকে অবিশ্বাস করতে পারচি না, অথচ যে ঠিকানা দিয়েচে, সেখানে গিয়ে দেখলাম—সে একটা মুদীখানার দোকান—আমার বহুদিনের চেনা, কেবল তার নম্বরটা জানতাম না। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম—চপলা নাম ক'রে কাউকে চেন? সে বল্লে—চিনতাম বাবু, সে সব কথা আর আজ নতুন করে তুলে লাভ কি,—বলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আমি বিরক্ত হয়ে বল্লাম—তা নয়, একজন শিক্ষিতা মেয়ে—নাম চপলা দেবী এই ঠিকানায় থাকে কি? দোকানী বল্লে—সে কি বাবু এই মুদীর দোকানে কি ক'রে থাকবে?—আমি বল্লাম, তাওত বটে। আশে পাশের বাড়িতে অনুসন্ধান করলাম, সবাই আমাকে ভাগিয়ে দিলে।

৯ই জুলাই—আজ সমস্ত দিনটাই খারাপ লেগেচে। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে একটা যেন কিনারা করেচি বলে আস্ফালন করেছিলাম, এখন বুঝতে পারচি—সেটা ঠিক নয়। চপলা যে খেলো নয়, তা প্রমাণ করতে অনেক কথাই বলতে হয়েচে, কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই। এখন এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, সে কাউকে সহজে ধরা দেবার নয়, সুতরাং সে খেলো নয়।

এই কথা ভাবতে ভাবতে এক্ষুনি আর একটা কথা মনে হচ্চে। আচ্ছা, এমনও ত হ'তে পারে যে, সে সহজে কেন, কিছুতেই ধরা দেবে না। সে হয়ত এমন কাউকে ভালবেসেচে যাকে তার জীবনের আদর্শ হিসাবেই পেয়েচে। অথবা সে বিধবা, যাকে পেয়েছিল তাকে জন্মের মত হারিয়ে তার স্মৃতিটুকু নিয়ে জীবন কাটাতে চায়। যে-প্রাণ কালের ফুৎকারে নিবে গেছে—তারই অনির্ব্বাণ জ্যোতি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেচে—সে হয়ত কেবলি চলবে—আর থামবে না।

তবে আমাকে যে সে ভালবাসে একথা স্বীকার করে কেন? নিশ্চয়, আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যে। দেবীর দিকে কলুষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম—তাই বোধ হয় এমন শিক্ষা দিতে চায়, যা চিরদিন আমার মনে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে। তার শুভ্র পবিত্র রিক্ত জীবনে, আমার মত একটা ক্ষুদ্র কলঙ্কের দাগও সে রাখ্‌তে চায় না।

ওঃ আম কি ভুলই করেচি!—কিন্তু ভুলের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা, সেই ত চরম শিক্ষা। এখন সে যদি সব কথা খুলে একখানা চিঠি দেয়, তবে আমি বাঁচি। হয়ত তাই লিখবে বলে প্রস্তুত হচ্চে। হয়ত দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারে নি—তাই ঠিকানা দেয়নি। এর পরেই যে চিঠিখানা পাব তার মধ্যে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট ত থাকবেই, উপরন্তু থাকবে তার জীবন-কথা।—তার রিক্ত জীবনের দুঃখের ইতিহাস!

কিন্তু থেকে থেকে আমার কেবলি মনে হচ্চে, সে আমাকে ভালবেসেচে।—এমন কি, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাই আমার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে তার এত চেষ্টা। বুঝতে পারাছ সব ব্যর্থ হবে।—কিন্তু তা যদি হয়, তবে আমার উচিত তাকে সাহায্য করা। তার প্রাণ যা চায় তাই তাকে পাইয়ে দিতে হবে, এবং তাকে বাঁচাতে হবে—তার প্রবৃত্তির হাত থেকে।

সে ত অনেক চেষ্টা ক'রে, অনেক রাত জেগে, হৃদয়ের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রেও আমাকে লিখবে—প্রিয়তম, আর পারিলাম না। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি একজনকে হারাইয়াছি, কিন্তু দশজনে আমাকে পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে। আমি আর দশ জনকে চাই না, তোমাকেই চাই। এর উত্তরে আমি কি

লিখব? সে কথা ভেবে রাখতে হবে। আমি বরঞ্চ আগেই তার উত্তরটা লিখে রাখি!

—তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক, তবে সে যে আমারি অপরাধ। আমার কী অধিকার আছে তাকে গ্রহণ করি?—যদি সত্যি ভালবেসে থাক, তা হ'লে আমি সেই ভালবাসা তোমার দেবতার চরণে পৌছে দিলাম। —তোমাকে যিনি ভালবেসেছিলেন তিনি আজ স্বর্গে। তুমি এতবড় ভাগ্যহীনা যে, সেই দেবতাকে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে পূজা ক'রে ধন্য হবার আগে, আর এক নিষ্ঠুর দেবতা তাঁকে তোমার দুর্ব্বল বাহু-লতার আশ্রয় থেকে কেড়ে নিয়ে গেলেন।

যাঁকে প্রাণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তোমার হৃদয় আকুলি-বিকুলি করেছিল—যাঁকে পেয়ে তোমার জীবনের কুঁড়ি ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছিল, সেই দেবতা যেদিন তোমার জীবন-দেউল আঁধার ক'রে মরণের পরপারে চলে গেলেন, সেইদিন থেকে তোমার দুর্দ্দিন। পূজার মালা গাঁথা হ'ল, নৈবেদ্যের ডালি সাজানো হ'ল, আরতির প্রদীপ জ্বলল,—অর্চ্চনার ধূপে মন্দির ভ'রে উঠল, কিন্তু দেবতা তোমার পূজা গ্রহণ করলেন না। তাঁর পূজারিণীকে সংসারের কঠিনতম ক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে, তাকে এক কঠিনতম পরীক্ষা করবার জন্যে আড়ালে চলে গেলেন।

—আজ বারবার আমার সেই অদেখা-বন্ধুর কথা মনে হচ্চে। তার নাম জানিনা—তাকে বন্ধু বলেই সম্বোধন করচি। হে বন্ধু, তুমি এস, এস। তোমার ফেলে-দেওয়া রত্নকে আবার বুকে তুলে নাও; সে বড় দুর্ব্বল, তাকে বাঁচাও।

তুমি তার প্রাণের ওপর, মনের ওপর, আঁখির পাতার ওপর নেমে এস। তাকে স্বপ্নে দেখা দাও। তাকে বলে যাও, আমি যে তোমারি জন্যে দীর্ঘদিন, দীর্ঘরাত্রি দুয়ার খুলে বসে আছি। আমি তোমার প্রেমের যে স্বাদ পেয়েছিলাম, তা যে আজও ভুলি নি।

হে বন্ধু, এমনি ক'রে তোমার প্রিয়তমাকে বলে যাও। তার বসন যে মলিন হ'য়ে পড়েচে, তার ফুল যে শুকিয়ে যাচ্চে, এখনো কি তোমার সময় হ'ল না?—তুমি এস, এস। সে যে তোমাকে না দেখতে পেয়ে, তোমার অভাবের তীব্র জালা ভুলতে যেয়ে—জীবনের ওপর দাগ কাটতে আরম্ভ করেচে, সে দাগ তোমার স্নেহের হাতে মুছে দিয়ে তাকে বাঁচাও। তাকে আর পরীক্ষা কোরো না,—তুমি কি জান না, মানুষ কত দুর্ব্বল?

১০ই জুলাই—ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে কাল রাত্রে যখন চিঠি খানা শেষ করলাম, তখন আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব পুলক জেগেছিল। মানুষ নিজেকে না চিনে কত দুঃখই ভোগ করে।—আমি আমাকে চিনতাম না, কিন্তু এই চিঠি লেখার পরে চিনেচি। যে শক্তি আমার মধ্যে সুপ্ত ছিল, তার সন্ধান পূর্ব্বে না জেনে এত বড় ভুলটা করেচি। আমি যে ভুলের জন্যে লজ্জা পাচ্চি, এই আমার সান্ত্বনা।

চপলার স্পর্শে আমার সমস্ত শক্তি জাগবে, এ আমি জোর ক'রেই বলচি। আর এটাও ঠিক যে আমার এ চিঠি যদি সে পড়ে, তবে সে পাগল হবে।—একদিকে তার দুঃখ জাগবে,—আর একদিকে আনন্দ।

১১ই জুলাই—আমার যত ক্ষমতাই থাক, দৈব ক্ষমতা যে নেই, তা মানতে হচ্চে। আজ চপলার চিঠি পেয়ে তা বুঝলাম। নিজেকে চিনেচি বলে গর্ব্ব করাটা কিছু না। হৃদয়টা যেন হাজার-দুয়ারী।—এর এক দুয়ার খুলে যা পাই,—মনে হয় পাওয়ার শেষ হ'ল। আবার আর একটা দুয়ার যখন খুলে যায়,—তখন দেখি পাওয়ার অন্ত নেই।

শাস্ত্রে বলেচে, নিজেকে জান।—কথাটা খেলো মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল—সংসারের সব চেয়ে সহজ কাজ হচ্চে নিজেকে জানা, কিন্তু আজ অন্য রকম মনে হচ্চে!—

ভুল ঠিকানায় চিন্তা-স্রোত যে পথে চলছিল—চিঠি পেয়ে তা আবার অন্য পথে চলতে আরম্ভ করেচে। তত্ত্বের বেড়ায় ঘিরে নিজেকে বেশিক্ষণ আবদ্ধ রাখা চলে না। তা যদি হয়, তবে মন,—তোমার যে পথ আমারও সেই পথ। আজকের চিঠিতে সে যা লিখেচে, সেটাও অবিশ্বাস করাই হয়ত বুদ্ধিমানের কাজ। চিঠিটা অন্যের হাতের

লেখা —লিখেচে—পরন্তু বড় অন্যায় করিয়াছি। আমি নিজে ভাল লিখিতে পারি না সেই জন্য আমার এক পুরাতন বন্ধুকে দিয়া লেখাই। আমার প্রায় অসুখ করে,—একজন ডাক্তার আমাকে বরাবর চিকিৎসা করেন। তিনিই আমার বন্ধু, তাঁহাকে কিছুই গোপন করি না। তাঁহাকে ধরিয়া আগেকার চিঠিগুলি লিখাইয়া লইয়াছি। আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তিনি ঠিক তাহা লিখিয়াছেন কিনা জানিনা। পরে আজ তিনি বলিলেন যে ভুল ঠিকানা দিয়াছি। এই কারণ তাঁহার সঙ্গে আমার ঝগড়া হইয়াছে, সুতরাং আজ অন্য লোককে দিয়া লিখাইলাম। আজ যে ঠিকানা দিলাম এটা প্রকৃত। কাল রাত নটার সময় অবশ্য অবশ্য আসিবে—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।

...চিঠিটা অন্যের হাতের লেখা, অথচ আমার সন্দেহ কিছুতেই ঘুচচে না। সে লিখতে পারে না, এটাও যেমন সত্য নয়, তেমনি সে যে তার প্রাণের কথা আর পাঁচজনকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করেচে এটাও সত্য নয়। তবু হয়ত কাল গিয়ে দেখব, ঐ ঠিকানায় একটা বাড়িওলা বসে আছে।

কিন্তু না গিয়েও ত পারব না। কাল রাত নটার সময় যে পা চলবে—সে এখন থেকেই আনন্দে নাচে।

আমার মন বলচে, না গেলে কেমন হয়, কিন্তু আমার দেহটাকে ঠেকানো দুঃসাধ্য হবে। মনটা বারোমাস দেহের মধ্যেই বাস ক'রে এল কিনা। বাইরে যদি থাকত তা হ'লে স্বাধীনতাও থাকত।

ঐ চিঠিটা সঙ্গে নিতে হবে। চপলাকে দেখাতে পারলেই লেখাটা সার্থক হয়। ওকে নীতি উপদেশের পর্দ্দায় ঢেকে ফেলতে হবে—এমন ক'রে ঢাকব, যাকে বলে পর্দ্দানসীন।

১২ই জুলাই—আজ কিছুই লিখিব না।

১৩ই জুলাই—যে দিন তাজমহল গড়া শেষ হ'ল, ঠিক তার পরদিন সেটা ভেঙে পড়লে শাজাহানের মনের অবস্থা কি হ'ত তা আমি ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

আমার সব শেষ হয়েচে। মনে করেচি ডায়েরী ও আর লিখিব না।

—ফুলের যদি কিছু মূল্য থাকে, তা আমি পেয়েচি, মা ফলেষু কদাচন—

এ বাক্যটি আজ আমাকে তৃপ্তি দেবে।

আমি কি শেষ দেখতে পেয়েচি? মন তা' স্বীকার করবার আগে চোখ বলে, পেয়েচি। চোখ মনকে দমিয়ে দিয়েচে।

কাল রাত নটার সময় আট নম্বরের বাড়ির সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিলাম। যেটুকু আভাস পেয়েচি, সেইটুকু লিখে রাখবার মত নয়, কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করেচি, সেখানে আমার প্রবেশ অসম্ভব।

এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েচি। মনে করচি ওটাও হয়ত ভুল ঠিকানা। কিন্তু নির্ভুল হবারও যে সম্ভাবনা আছে, আমার মনের সন্দেহই তা প্রমাণ করচে, চোখের কিন্তু সন্দেহ নেই। তবু মনকে আজ জোর ক'রেই বোঝাব যে ওটা ভুল ঠিকানা।

Benefit of doubt-এ নরহন্তা মুক্তি পায়, সুতরাং এতে ক'রেই আমার মানসীকে মুক্তি দিলাম।

মাসিক-সংবাদ

নজরুল-সম্বর্দ্ধনা—বিগত ১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ২ঘটিকার সময় কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে কবি নজরুল ইসলামকে স-সমারোহে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন, সুভাষ চন্দ্র বসু, অপূর্ব্বকুমার চন্দ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আচার্য্য রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নজরুলকে প্রতিভাবান বাঙালা-কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলেন, বাঙালা-কবি আখ্যাতেই নজরুলের সব চেয়ে বড়ো পরিচয়, কারণ তাঁর কবিতায় সাম্প্রাদায়িকতার গন্ধ নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নজরুলের দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের ভিতর আমরা দেশের রাজনৈতিক—বিশেষ করে জেল-জীবনের কোনো প্রাধান্য দিই না; আনন্দের কথা নজরুলের কবিতায় তার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।—তিনি নিজের জীবনেই সেই সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

অভিনন্দনের উত্তরে নজরুল যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি কথা তুলিয়া দিতেছি,—

> "আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্ত্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগৃহের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি * * * * আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারি নি; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জল স্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমা যেন খর্ব্ব না করি!—যেন দুর্গম পথে পথ না হারাই।........."

আমরাও বলি, কবির এই প্রার্থনা সফলতায় ভরিয়া উঠুক্, কবির দৃষ্টি আরও সুদূর-প্রসারী হোক, কবির জীবনের পথ সুদীর্ঘ ও কুসুমাস্তীর্ণ হোক্।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র-প্রিয় প্রথিতযশা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৯শে নভেম্বর সকাল ৭টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

ললিতকুমার ছিলেন রস-সাহিত্যিক—রসস্রষ্টা। বাঙালীকে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া রসের খোরাক্ জোগাইয়াছেন; তাঁহার 'পাগ্‌লা-ঝোরা', 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া কে না অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়াছে? শেষ জীবনে তিনি 'ভোজন সাধন' ও 'কেদার বদরী' রচনা করিয়া গিয়াছেন। তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ সমূহে এইরূপ চিরন্তন হাস্যরসের প্রাচুর্য্য বড় একটা আজকাল চোখে পড়ে না। ললিতকুমারের 'সাহারা', 'ছড়া ও গল্প', 'কাব্যসুধা', 'সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা' প্রভৃতি যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার প্রভূত গবেষণা-শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। পাঠ করিলে, পাঠক-পাঠিকার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের প্রস্রবন সহস্র-ধারায়

উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র সমালোচনায় তিনি যে মনীষা ও অন্তঃদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' 'সখী' 'কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা' 'প্রেমের কথা', 'মোহিনী' প্রভৃতি সুনামখ্যাত গ্রন্থগুলির পাতায় পাতায় বিদ্যমান আছে।

সমালোচকের অন্তঃদৃষ্টি লাভ করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না, তাহা দৈবদত্ত জিনিষ। কিন্তু ললিতকুমারের মধ্যে সেই অন্তঃদৃষ্টি ছিল সুক্ষ্ম এবং সুপ্রচুর। প্রত্যেকটি জিনিষকেই তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি ও অসাধারণ অন্তঃদৃষ্টি দিয়া দেখিতেন, তাই তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় গভীরতা বর্ত্তমান থাকিত। তাঁর যুক্তিকে তিনি কখনো সাবানের ফেনা বা কাচের ঘরের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সেসব উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব। 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' বা 'ক'কারের অহঙ্কার'-এ ইহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম যৌবনেই ললিতকুমার বিদ্বজ্জন-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই ভাষাজননীর সেবায় তিনি কায়মানোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুরেশ সমাজপতির সম্পাদিত 'সাহিত্য' যখন শ্রেষ্ঠ মাসিকরূপে বাঙালী পাঠক মহলে সমাদৃত, তখন ললিতকুমারের রচিত 'গোরুর গাড়ি' প্রমুখ সরল রচনাগুলি রসিক পাঠক সমাজকে বিমুগ্ধ ও পুলকিত করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ও অতি তুচ্ছ বিষয়বস্তু অবলম্বনে নির্ম্মল আনন্দের দ্যোতক, রসমাধুর্য্যপূর্ণ এমন প্রবন্ধ রচনা করা যে অদ্ভুত শক্তি ও সাধনার পরিচায়ক, সে-যুগের রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

আমরা এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

দেবকুমার রায় চৌধুরী—বরিশালের জমিদার ও কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাঙ্‌লা-সাহিত্যের সঙ্গে যাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাহারাই দেবকুমারের নাম জানেন। এককালে তাঁহার 'অরুণ' কাব্য-রসিক বাঙালী পাঠককে অনেকখানি কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছিল। তাঁহার ভাষা যেমন স্বচ্ছন্দগতি, তেমনি ভূষণভূয়িষ্ঠ; ভাবের মধ্যেও আন্তরিকতার বিকাশ দেখা যায়। গদ্য রচনায়ও তাঁহার হাত কম নিপুণ ছিল না। তাঁহার রচিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বইটি উচ্চশ্রেণীর জীবনী।

শুধু কবি হিসাবে নয়, সহৃদয় মানুষ রূপেও তাঁহার অভাব পরিচিতজনের বুকে একটি স্থায়ী শোকচিহ্ন আঁকিয়া রাখিবে।

বরদাকান্ত মজুমদার—সুপ্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্য রচয়িতা বরদাকান্ত মজুমদার সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি শিশু-সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি

শুচিতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'আমার মনে হয়, সুন্দর বস্তু দেখে মনে যে আনন্দ হয়, তাহা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আহুত রবাহুতগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে না পারলে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভোগই করা হয় না।' তাই তিনি পত্রাকারে তাঁহার বাল্যবন্ধুর বিভূতিভূষণের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়টি প্রকাশ করিয়াছেন। রচনার লঘু প্রবাহের মাঝে এমন একটি সরল শোভনতা আছে, যাহা পাঠকের মনকে ব্যাহত করে না।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম চার আনা।

সতীধর্ম্ম

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

উপক্রমনিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'অনন্যগামিনী হইয়া শুধু পতিতে অনুরক্তি রক্ষার নাম যে সতীত্ব, প্রকৃত সতীত্বের গণ্ডী উহারও বাহিরে বহুদূরপ্রসারিত।...এই বৃহত্তর সতী-ধর্ম্মের স্বরূপ কি, কি করিলে উহা লভ্য হয়—সে-কথাই এই গ্রন্থে যথা সম্ভব আলোচিত হইয়াছে।

যাঁহারা গৃহের লক্ষীস্বরূপা, এই গ্রন্থে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে।

ছাপা ও বাঁধাই ভালো। দাম পাঁচসিকা।

শ্রীরামচরিত

পণ্ডিত শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী

উল্লিখিত গ্রন্থখানি নাটক। কবি ভবভূতির সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে শাস্ত্রীমহাশয় এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইহাতে তাঁহার স্বরচিত অংশ থাকিলেও, আগাগোড়া গ্রন্থখানির সামঞ্জস্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নাটকটির ভাষা বর্ণচ্ছটাবহুল, উচ্ছ্বাসময়। তবে, নাটক রচনার ক্ষমতা থাকিলে, গান রচনা করাও সহজ—ইহা মনে করা একান্ত ভুল।

প্রকাশক—বেঙ্গল পাব্‌লিশিং হোম। দাম একটাকা।

শ্রীকেশব সমাগম

শ্রীমতিলাল দাশ বি, এ,

মহামানব যাঁহারা, তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহাদের জীবন জরা বার্দ্ধক্য ও ক্ষয়ের অতীত। তাঁহাদের অমর আত্মা অম্লান দীপশিখার মত পতিত মানবজাতিকে কল্যাণপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। মহামানবদিগের জীবনকাহিনী তাই কখনো পুরাতন হয় না।

উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের পবিত্র জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে চিন্তাশীলতা ও সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। মহামানবেরা সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব জাতির। তাই, সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট এই গ্রন্থটি সমাদৃত হইবে, আশা করি।

মঙ্গল কুটির, বিধানপল্লী, রমনা (ঢাকা) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম একটাকা।

ঠিকানা

শ্রীভবেশ দাশ গুপ্ত

ছোট্ট একটি নাটক। ছেলেদের উপযোগী রস-রচনা। প্রচ্ছদপটের ছবিখানি চোখে পড়িলেই, তরুণ-মনের বাতায়নে অমনি কৌতুহল উঁকি দেয়। লেখকের ভাষাও যেমন স্বচ্ছন্দ সরল, রচনা-ভঙ্গীও তেমনি চিত্তাকর্ষক। সমগ্র নাটকটির মধ্যে স্বচ্ছ একটি হাস্যপ্রবাহ কলঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। শিশু-সাহিত্যে লেখকের আত্মপ্রকাশ এই প্রথম হইলেও, কচি মনকে বশ করিবার কৌশল তাঁহার ভালো রকমই আয়ত্ত বলিয়া মনে হয়।

বইখানির আকৃতিতে ও সৌষ্ঠবে নূতনত্ব আছে। সুন্দর ছবিও আছে কয়েকখানা। ছ' আনা দাম। প্রকাশক— শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, গোলাপ পাব্লিশিং।

—

বেঙ্গলী সনেট্‌স্

রচয়িতা—আসাদ্ উল্লাহ্

পঞ্চাশটি সনেট্ একত্রিত করিয়া, এই কবিতা পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সনেটগুলি শেক্সপীয়রের ছাঁদে রচিত— লেখকের প্রথম যৌবনের প্রথম রচনা। সে-কারণে তাঁহার রচনায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক সনেটেই তিনি তাঁহার অন্তরাসীন প্রেমিকার নব নব লীলার পরিচয় দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

নবীন সাহিত্য-সেবীর সাধনা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে, আশা করি।

গ্রন্থকার কর্তৃক ৫২।৪, মির্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

—প্র

—

বার্ষিক শিশুসাথী

১৩৩৬ সন, চতুর্থবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

প্রতি বছরেই পূজার সময় আশুতোষ লাইব্রেরী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য 'শিশুসাথী'র একটি বার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় মনোরম গল্প, কবিতা, দেশবিদেশের কথা, সহজ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, প্রচুর রঙ বে-রঙের ছবি—কোনোকিছুরই অভাব নাই। এক কথায় ছোটদের মন ভুলাইবার সকল রকম উপাদানই আছে। সম্পাদক স্বয়ং শিশু-সাহিত্যের একজন নামজাদা লেখক, শিশুদের মনের অলি-গলির খোঁজ-খবর তিনি রাখেন। কাজেই এ-কাগজ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। কেবল অন্তঃসৌষ্ঠবই নয়, কাগজের বহিঃসৌন্দর্য্যও ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করিবে। ঝরঝরে ছাপা; কাগজ ও বাঁধাই খুব উঁচুদরের। দাম দেড় টাকা মাত্র।

—

শ্রীবৎস

শ্রীমন্মথ রায়, এম-এ প্রণীত

পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দাম এক টাকা।

মন্মথবাবুর নাটকের নতুন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাঙলা নাট্যসাহিত্যেকে তিনি এক নবরূপ দিয়াছেন। তাঁহার কথাবস্তু, ঘটনার সংযোজনা প্রভৃতি সকলই প্রচলিত একঘেয়েমিকে এড়াইয়া গিয়াছে। 'মুক্তির ডাক', 'দেবাসুর' ও 'চাঁদসওদাগর'-এ তিনি একাধিকবার তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁহার পূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে, বর্ণনার বিন্যাস এবং ভাষার স্বচ্ছপ্রবাহের ভিতর প্রচুর কৌতুক ও আনন্দের রসধারা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ পৌরাণিক নাটকে এ ধরণের রসসৃষ্টির সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। আখ্যায়িকাকে বাঁচাইয়া রাখিতে গিয়া অনেকেই চরিত্রের স্বাভাবিকতা এবং ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না,—আনন্দের কথা, মন্মথবাবু সে-ধরণের নাট্যকার নহেন।

—